বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্র

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্র

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্র

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

অনিন্দ্য প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৪৪০৩

বর্ণবিন্যাস
সেতু কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২ ৩৬০৫

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

The Educational Senario of Bangladesh
by Dr. Mamtazuddin Patwari
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
6 Shrishdas Lane Dhaka-1100 Phone 71 2 44 03
First Published in February 2007
Price : Taka 175.00
US $ 8.00

ISBN 984 8740 18 X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শরফুদ্দিন আহম্মদ বিএসসি, বিএড, এমএড,
১৯৭১ সালে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক থাকা
কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন,
এর আগে ষাটের দশকের শুরুতে তাঁকে প্রধানশিক্ষক হিসেবে
আমি পেয়েছিলাম মাধাইয়া হাইস্কুলে,
সততা, কর্তব্যপরায়ণতায় তিনি আমাকে আন্দোলিত করেছিলেন,
আমার এই শিক্ষাগুরুকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশে এত বছরেও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি চালু করা গেল না। অথচ প্রতিটি সরকারই একটি করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নিজেরাই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা থেকে পিছু হটেছে। ফলে বাংলাদেশ কার্যত শিক্ষানীতির আলোকে গড়ে-ওঠা কোনো ব্যবস্থা গড়ে-তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার সুযোগে দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা, বেসরকারি, এনজিও, কওমি, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি, কোরান শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারা-উপধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—যেগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি অনুদান পেলেও নানা দুর্নীতি, অনিয়ম, বৈষম্যে যেভাবে চলছে তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে চরম নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, শিক্ষার নামে বেসাতি তথা বাণিজ্য, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি। দেশে সত্যিকার অর্থে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া, পরিচালনা করা এবং শিক্ষাক্রম কার্যকর রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসব এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। সে কারণে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খোঁজে মানুষ ভিড় করছে কতিপয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে। এমনটি মোটেও প্রত্যাশিত নয়, অথচ দিন দিন বাংলাদেশে মানহীন শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই একচেটিয়া হয়ে উঠছে।

কীভাবে দেশের শিশু, কিশোর, তরুণদের মানবসম্পদ ও সচেতন মেধাবী, সৃজনশীল মানুষরূপে গড়ে তোলার লেখাপড়া ও গবেষণায় শিক্ষিত করে তোলা যাবে তার কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যায় যথেষ্টসংখ্যক বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষালাভে জনগণ দিনদিন বেশি-বেশি বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য দুরূহ হয়ে উঠছে বলে ধারণা করছি। ফলে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানজনক আসন নিয়ে দাঁড়াতে হলে মানসম্মত শিক্ষার জন্য যা যা করণীয় তা দ্রুতই করতে হবে। এর জন্য প্রথমেই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সুবাতাস সৃষ্টি হবে। এর কোনো বিকল্প পথ বাংলাদেশের সম্মুখে খোলা আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতি আমাদের এতটাই জটিল, কঠিন এবং সর্বগ্রাসী।

গত শতাব্দীর আশি এবং নব্বইয়ের দশক থেকে আমি পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কমবেশি লেখালেখি করে আসছি। আমার লেখালেখির অন্যতম বিষয়

www.pathagar.com

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। যেহেতু বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমি একজন ছাত্র ছিলাম, গত দুই দশকের কিছু বেশি সময় ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থায় আমি একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি, শিক্ষকদের নানা সমস্যা নিয়ে একসময় শিক্ষকসংগঠনের আন্দোলন, সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম; তাই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাসমূহ ভেতর থেকে দেখা, বোঝা, এবং উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ থেকেই দৈনিক সংবাদ, ভোরের কাগজ, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, আমাদের সময়, জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক আমার লেখালেখি।

সম্প্রতি অনিন্দ্য প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী জনাব আফজাল হোসেন আমার শিক্ষাবিষয়ক নিবন্ধ ও প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষাবিষয়ক বেশকিছু লেখাই এখন আর আমার সংগ্রহে নেই, পত্রিকাগুলোতে রয়েছে। আমার স্ত্রী আনোয়ারা মমতাজ বেশকিছু লেখা পত্রিকা থেকে কেটে জমা করছেন। সেই সংগ্রহের মধ্যথেকে শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি লেখা নিয়ে *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্র* শিরোনামে একটি বই প্রকাশের এই আয়োজন। আমি তাঁকে এ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক মোহাম্মদ সা'দাত আলীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটির কম্পোজ, প্রুফ-দেখা এবং ছাপার কাজে যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাধারণ পাঠক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সুধীসমাজের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে যদি আমার চিন্তাসমূহ মিলে যায় তাহলে আমার লেখালেখি সার্থক বলে মনে করব। পাঠকদের যে-কোনো মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশে শিক্ষক ও শিক্ষকতা : সমস্যা ও সম্ভাবনা ১১
ছাত্রলীগ সম্মেলন, ছাত্রসংগঠন, ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি ১৫
হায়! ঢাকা কলেজ এবং দেশের ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ২০
এসএসসির ফলাফল : গ্রাম বনাম শহর, শহর বনাম শহরে বৈষম্য ২৪
ইডেন এবং দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার হালচাল ২৮
মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রম নানামুখী সংকটের পদধ্বনি ৩৩
একমুখী শিক্ষা স্থগিত, বহুমুখী সমস্যা উদ্ভূত ৩৮
এক বিজয়ী জাতির মুক্তিযুদ্ধের ছিন্নভিন্ন ইতিহাস ৪৩
আন্দোলন-সংগ্রামে নানা শিক্ষকসংগঠন ৪৯
এইচএসসির কৃত্রিম ফল বিস্ফোরণ মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে ৫৪
বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ৫৯
নামে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে, বাস্তবে উচ্চশিক্ষা উবে যাচ্ছে ৬১
মাধ্যমিক শিক্ষার মান বেড়েছে কি? ৬৭
নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : মানোন্নয়ন করতেই হবে ৭২
পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ ৭৭
'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে' লাঠিয়াল-পাহারাদার বাহিনী! ৮৩
ঢাবি, বুয়েট ও দেশের উচ্চশিক্ষা ৮৭
বিশ্বের শীর্ষ পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের ঠাঁই নেই কেন? ৯১
হে বিশ্ববিদ্যালয়! তুমি কার ও কেন? ৯৬
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আমাদের অজ্ঞত-মূর্খতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা ১০২
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০০৫ : কতটা স্বাভাবিক, কতটা ভালো? ১০৬
বিপর্যয়টা পরীক্ষার ফলে নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাতেই ১১১
শোনো হে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিকৃতকারীগণ শোনো ১১৭
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা : গলদ নিরসনের উপায় কী? ১২৩
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিকৃতি এবং বিকৃত মানসিক ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি ১২৮
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা সক্ষম? ১৩৩
স্কুলপাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকার বিকৃত উপস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা ১৪৩
বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার অবস্থান ১৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশে শিক্ষক ও শিক্ষকতা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

আমাদের সমাজে বেশ আগে থেকেই 'গুরু' শব্দটি চালু আছে। যাদের কাছ থেকে কিছু শেখা হত তাদেরকেই গুরু বলে সম্বোধন করা হত, তাদেরকে গুরু বলে মানাও হত। গুরুর প্রতি ছাত্র তথা শিষ্যের শ্রদ্ধার বিষয়-আশয় বেশ প্রবল ছিল। একসময় আচার-আচরণ, জীবনপদ্ধতি, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক শিক্ষাগুলোই এই গুরুদের কাছ থেকে শিশুরা লাভ করত। গুরু-শিষ্যরা একই নিবাসে থাকতেন, শিষ্যরা গুরুদের সেবা-শুশ্রূষা, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। অধিকাংশ গুরুই থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে শিষ্যদের গড়ে-তোলার দায়িত্ব নিতেন। প্রাচীনকাল থেকে বেড়ে-ওঠা গুরু-শিষ্যের সংস্কৃতি হালে নেই; রাষ্ট্র ও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেই নৈতিকতার শিক্ষার যুগের অবসান অনেকটা আপনাআপনি ঘটে গেছে। গেল শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির অবশিষ্টাংশ আমাদের গ্রামগঞ্জে বেশ চোখে পড়ত। এখন শিক্ষার সেই সনাতন পদ্ধতি গ্রামেও তেমন একটা চোখে পড়ে না। কারণ, এইসময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান ঘটেছে, শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগসুবিধা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষায়তনে যাচ্ছে; সেখানে পাঠদানের জন্য শিক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আছেন। প্রাচীন গুরু-শিষ্যের সংস্কৃতির স্থলে আধুনিক শিক্ষক-ছাত্র পরিচিতি চালু হয়েছে। শিক্ষকতা একটি পেশা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে, শিক্ষকগণ শিক্ষকতার পেশা অবলম্বন করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন। আধুনিক বিশ্বসভ্যতার নিয়মেই শিক্ষা, শিক্ষকতা, ছাত্র এবং লেখাপড়ার এমন নির্দিষ্ট অবস্থান, পরিধি ও পরিচিতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি পশ্চাৎপদ সমাজে মাত্র ৫০/৬০ বছরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ও অর্জন সাধিত হয়েছে তার গুরুত্বকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে এখন প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি, বেসরকারি) শিক্ষার আয়তন কতখানি বিস্তৃত হয়েছে তা শিক্ষার জগতের মানুষরাও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে হয়তো বলতে পারবে না। আমরা সত্যিই বলতে পারব না যে, বাংলাদেশে এখন কেজি স্কুলের সংখ্যা কত। কেউ বলছেন ২০ হাজার, কেউ বলছেন ৩০ হাজার। এ বলাটি আসলে অনুমাননির্ভর। কেননা, কেজি স্কুল চালুর জন্য সরকারের প্রাথমিক

www.pathagar.com

বা গণশিক্ষার মতো কোনো অধিদপ্তরের কোনো অনুমতি নিতে হয় না। অবশ্যই তা নেয়া উচিত, রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম থাকা উচিত। নিয়ম কার্যকর নয় বলেই কেউ প্রকৃত সংখ্যাটি বলতে পারছে না। এ ছাড়া দেশে বিভিন্ন ধরনের এনজিওদের স্কুলের সংখ্যা কত সেই তথ্য নিয়েও নানা মত আছে। তবে এটি ৭০/৮০ হাজারের কম নয়। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ হাজারের মতো। বেসরকারি নিবন্ধনকৃত, কমিউনিটিসহ অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসার পরিসংখ্যানেও নানা হিসাব দেয়া হচ্ছে। তবে এই দুই ধারার মাদ্রাসার সংখ্যাও ৪০ হাজারের মতো হবে। দেশে নানাধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এ মুহূর্তে ৩০ হাজারের মতো হবে, এইচএসসি কোর্স চালু আছে এমন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ পূর্ণাঙ্গ কলেজের সংখ্যা মোটেও ৫ হাজারের কম হবে না। এ ছাড়া নানা ধরনের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা, প্রকৌশলী, নার্স, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ হরেক রকমের ডিপ্লোমা, প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ-ধরনের বিদ্যায়তনের সংখ্যা বাংলাদেশে কত তার কোনো পরিসংখ্যান সরকারের হাতে আছে বলে মনে হয় না। উচ্চতর স্তরে নানা পেশা ও শিক্ষার বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠান দ্রুত বেড়ে উঠছে। বলা চলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যার দিকে একটি অবিশ্বাস্য বিপ্লব ঘটে চলছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এইসব প্রতিষ্ঠানে এখন কর্মরত শিক্ষকের প্রকৃত তথ্যও আমাদের কারো জানা নেই। তবে এই দেশে কৃষি, গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক পেশার পর সংখ্যার দিকে চোখ ভড়কে দেয়ার মতো কোনো পেশার নাম যদি করতে হয় সেটি সম্ভবত শিক্ষকতা।

আমাদের সাধারণ অনুমানে বাংলাদেশে এখন ১০ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ শিক্ষকতা পেশার ওপর নির্ভরশীল। দেশে এতসংখ্যক মানুষ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত, এটির গুরুত্ব মোটেও কম নয়। পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ আছে যেখানে ১০/১২ লক্ষ মানুষ খুঁজে পাওয়াও বেশ কষ্টকর। আমার ধারণা, ২০২০ সালে বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকবেন প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটি ব্রিটিশ বা পাকিস্তান-যুগে যেভাবে গড়ে উঠেছিল তাতে ঔপনিবেশিক উদাসীনতা ছিল, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া ব্রিটিশযুগের শেষ এবং পাকিস্তান যুগের শুরুতে দেশের বিভাজিত রাজনীতি এবং অবশেষে দেশবিভাগের ফলে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের বড় অংশই বাংলাদেশ ভুখণ্ড ত্যাগ করেছেন। তাদের স্থান যারা পূরণ করেছেন তাদের বেশিরভাগেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতায় যথেষ্ট অভাব ছিল। অধিকন্তু সেই সময়েও শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ কম থাকার ফলে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা খুব একটা এগিয়ে আসেনি। স্বাধীনতা-উত্তর একটি শিক্ষানীতির উদ্যোগ থাকলেও দেশে এ-পর্যন্ত কোনো শিক্ষানীতি গৃহীত না-হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থাটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবসায়িক চাহিদা থেকে বেড়ে

www.pathagar.com

উঠেছে। পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিকে সম্বল করেও দেশে একাধিক ধারার ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা পেশাকে মেধাবীদের জন্য আকর্ষণীয় করা হয়নি। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, যারা বাড়িতে হালচাষ, গরু পালা, দোকানদারির পাশাপাশি অন্য কোনো খাত থেকে কিছু আয়-উপার্জন করতে পেরেছে তারাই বেশ কয়েকটি স্তরে শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

মেধাবীদের আকৃষ্ট করার মতো বেতনকাঠামো, সুযোগসুবিধা, ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা সরকারি-বেসরকারি কোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সৃষ্টি হয়নি। ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষাজীবনের অধিকারীদের বেশিরভাগই প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কলেজ স্তরের শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ব্যতিক্রম এখানে কিছু থাকলেও তা নিতান্তই ব্যতিক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দলীয় প্রভাব ও পরিচিতি শিক্ষকতার চাকরি লাভে এখন এতটাই কার্যকর ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা এখান থেকেও বিতাড়িত। মেধাবীদের একটি বড় অংশই সরকারি ক্যাডার সার্ভিস, বিদেশি কোম্পানি, ব্যাংকসহ বেসরকারি কিছু কিছু স্মার্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, ভালো বেতন পাচ্ছেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজে হয়তো একটা পরিচিতিও লাভ করছেন। কিন্তু একজন মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাও শিক্ষকতার পেশায় নিজেকে যতখানি বিকশিত করার সম্ভাবনা রয়েছে; দেশ ও জাতিকে যতবেশি মেধা, মনন, সৃষ্টিশীলতা, গবেষণায় উদ্দীপিত করতে পারার সম্ভাবনা আছে তা আমলাতন্ত্র বা অফিসনির্ভর প্রতিষ্ঠানে থাকা সম্ভব নয়। সেখানে মেধাবীদের মেধার চর্চাকে অনেকটা রুদ্ধ করে দেয়া হয়। অথচ কেবলমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই তাদের সুযোগ ছিল নিজেদেরকে উদ্ভাসিত করা, নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা ও যুগের চাহিদামতো আলোকিত করে তোলা। কিন্তু শিক্ষানীতির অনুপস্থিতি, নিয়ম-নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থা সংখ্যায় যতবেশিই হোক, টাকা যতবেশিই এই খাতে খরচ করা হোক না কেন; বই-পুস্তক-খাতাপত্রের বোঝা যতই বাড়ানো হোক না কেন; ইংরেজি মাধ্যম, টাই-স্যুট পরে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে বসানো হোক না কেন, বিচিত্র এমবিএর বাহারি নাম, কম্পিউটার ইত্যাদির আয়োজন দেখানো হোক না কেন—দেশের শিক্ষার মান বাড়ানো কিংবা মেধাবী জনগোষ্ঠী তৈরি তাতে কোনো অবস্থাতেই হওয়ার হওয়ার কারণ নেই।

দেশে রাতারাতি বেশকিছু পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে, কিন্তু এগুলোতে মেধাবী শিক্ষকের আকাল যথাযথ অর্থেই পড়েছে। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষার মানে বড়ধরনের ধস নেমেছে বললে আশা করি অত্যুক্তি করা হবে না। যত নিচের স্তরের দিকে যাওয়া যায় ততই দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষকনিয়োগে দুর্নীতি, দলীয়করণ, আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা স্বাভাবিক

www.pathagar.com

নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষকতার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না, ছাত্রছাত্রীরা মেধাবী শিক্ষকের অভাবে যথাযথ শিক্ষালাভ করতে পারছে না। মনে রাখতে হবে শিক্ষক একজন শিক্ষিত মানুষ। তাঁর জীবন-জীবিকা হিসেবে শিক্ষকতার মর্যাদা অন্য গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো পেশা থেকে কোনো অংশেই কম নয়। সুতরাং যে-কোনো স্তরের শিক্ষকই হোক না কেন, তার বেতনভাতা এমন হওয়া উচিত নয় যা হলে তাকে বাড়তি উপার্জনের জন্য প্রাইভেট পড়ানো, ব্যাচে পড়ানোর পথ খুঁজতে হয়। বাংলাদেশে কোনো স্তরেই শিক্ষকদের সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার মতো বেতনভাতা দেয়া হয় না, তাই অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা এই পেশার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না। অথচ দেশে যেভাবে শিক্ষার দরজা খুলে গেছে, সেভাবে শিক্ষকতার পেশাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, শিক্ষক তৈরির উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে না, শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ ও আয়োজন করা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে গার্মেন্টেসের মতো অপ্রশিক্ষিতদের ধরে ধরে এনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষকতা ৮/১০টা চাকরির মতো চাকরি বা পেশা নয়, এটি একটি মহৎ পেশা, এখানে মিশন-ভিশন না থাকলে কেউ ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারার কথা নয়, উজ্জীবিত করারও কথা নয়। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে শিক্ষকনিয়োগটি বড়ই দায়িত্বহীনতার সঙ্গে চলে আসছে। ফলে সর্বস্তরেই আসল শিক্ষকদের খুব বেশি আমরা পাইনি, এই পেশায় যারা এসেছেন তাদের বেশিরভাগই চাকরি করার মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকে যেন এসেছেন। তাই বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বেশিরভাগই চাকরি করি, বাজার-সওদা করি, সংসারধর্ম করি, আসল কাজ শিক্ষকতা করি না। শিক্ষকতার মধ্যে সনাতন গুরুদের কিছু কিছু শিক্ষা তো একেবারেই হারিয়ে যাওয়ার কথা নয়, অস্বীকার করারও উপায় নেই। কিন্তু আমরা ১০/১২ লক্ষ মানুষ শিক্ষকতার পেশায় আসীন হলেও অনেকেই আমরা এর জন্য কখনো মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিইনি, সেভাবে পরবর্তী সময়ে নিজেদের গড়েও তুলিনি। ফলে দেশের বিশাল বিশাল সব শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দ্বারা খুব একটা আলোকিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। অধিকন্তু আমার মনে হচ্ছে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এক-একটি আদমজিতে পরিণত হয়েছে বা হতে হচ্ছে; লেখাপড়ার মানহীনতার কারণে কবে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দিতে হয় সেটিই এখন আমার আশঙ্কার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একটি শিক্ষানীতির আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে—যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষকতার মর্যাদা সবদিক থেকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে।

আমাদের সময়, সেপ্টেম্বর ২০০৬

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ সম্মেলন, ছাত্রসংগঠন, ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে হানাহানি, মারামারি, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অবিশ্বাস্য ঘটনার বিস্তার যে-পরিমাণ বেড়েছে, দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের ক্যাডার ও দুর্বৃত্তদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে—যা সম্পর্কে দেশের সবাই কমবেশি অবহিত, শঙ্কিত ও লজ্জিত—সেই প্রেক্ষাপটে কোনো একটি ছাত্রসংগঠনের অনুষ্ঠিত সম্মেলন নিয়ে কিছু লেখার কেউ তাগিদ অনুভব না-করারই কথা, কোনো পাঠকের তা মনোযোগ দিয়ে পড়ার কথাও নয়। দেশের ছাত্ররাজনীতি এবং ছাত্রসংগঠনের ভাবমূর্তি যখন এমন নিম্নপর্যায়ে অবস্থান করছে তখন কিছুটা ব্যতিক্রমের ছোঁয়া লাগানোর কারণে এবং সামান্য নতুনত্বের উদ্‌যোগ লক্ষ্য করায় ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনকে কিছুটা চোখ তুলে দেবার চেষ্টা থেকে এই লেখা। বলে রাখি, কাউকে খুশি করা বা ব্যথা দেয়া এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং নতুন এই উদ্‌যোগটি কীভাবে আরো কার্যকর, সংহত ও বেগবান করা যায়; ছাত্রসংগঠনকে একটি মর্যাদার আসনে, শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যস্ত থাকা, সক্রিয় থাকা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাজ করা যায় তেমন কিছু প্রত্যাশা নিয়েই কিছু লেখা, কিছু কথা বলা মাত্র। জানি না ছাত্রসংগঠনগুলো, তাদের মূল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো আমাদের এসব লেখা ও কথা পড়ার সময় খুঁজে পাবে কিনা। তবে আমাদের ভাবনাচিন্তাগুলো মনে হচ্ছে বলে যেতেই হবে—এই অবস্থান থেকেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অতীতে ছাত্রসংগঠনের সম্মেলন বলতে যেমনটি বোঝানো হত, দেখা হত, এখন বড় বড় ছাত্রসংগঠনগুলোর সম্মেলনে তেমনটি বলতে গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কিছুকাল ছাত্রসংগঠনের সম্মেলনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে বিস্তর বিচার-বিশ্লেষণ হত; ছাত্রপ্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য সম্মেলনে উপস্থাপন করত; ছাত্রসংগঠনটি জাতীয় রাজনীতি এবং ছাত্ররাজনীতির কিছু দিকনির্দেশনা, কর্মসূচি ও বক্তব্য নিয়ে ফিরে যেত; শেষে

www.pathagar.com

যথারীতি একটি সাংগঠনিক কমিটিও তারা সংগঠনকে উপহার দিত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে কমবেশি আগ্রহও থাকত। ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব যদি যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে না পড়ত তাহলে ছাত্রসংগঠনকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নেয়া, টিকিয়ে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ত। সে-কারণে নেতৃত্ব-নির্বাচনে বা বাছাইতে এ দিকগুলো প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই বিশেষভাবে খেয়াল রাখত।

ছাত্রসংগঠনের সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত দিনগুলি কখন, কীভাবে যে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে হারিয়ে গেল তা আমরা বুঝতেই চেষ্টা করলাম না। বিশেষত নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে ছাত্রসংগঠনগুলো মূল রাজনীতিক দলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীতে পরিণত হওয়ার পর এগুলো 'নেতা' বলে পরিচয়দানকারী কিছুসংখ্যক আদুভাই ও আদুবিবি অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার মোহে কব্জা করে ফেলেছে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দখল-বেদখলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষাকে তাদের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। ছাত্রসংগঠনগুলোতে প্রকৃত ছাত্রছাত্রী, মেধাবী, সৃজনশীলদের আর কোনো স্থান রইল না; এগুলোতে ছাত্র-অছাত্র, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, ক্যাডার, মাস্তান ও দুর্বৃত্তরা বাসা বাঁধল, হল-হোস্টেল, আশপাশের দোকানপাট, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ, ছাত্রভর্তি, সম্পদ টাকাপয়সা অবাধে লুটেপুটে খাওয়া ফ্রি-স্টাইলে চলল। এমন দুর্বৃত্তায়ন থেকে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বাদ পড়েনি।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মূলত সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। তবে ব্যতিক্রম শুধু একটি ছাত্রসংগঠনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী অবস্থান থেকেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দখলে রাখার ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে এগিয়ে গেছে। ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম সবক্ষেত্রে ঠিক থাকেনি। ইসলামী ছাত্রসংগঠনের দখলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে যাওয়ার পেছনে ঐ সংগঠনের নেতাকর্মীদের জীবনে একমাত্র কাজ হচ্ছে জীবনের বিনিময় হলেও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব বজায় রাখার ব্রত নিয়ে লেগে থাকা। এতে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের শহীদ হওয়ার, বিপ্লব অত্যাসন্ন করার স্বপ্নও দেখানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়ার কোনো আয়োজন সেই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে তেমনটি চোখে পড়ছে না।

বাংলাদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগঠনের দখলদারিত্বের বিনিময়ে জাতীয় রাজনীতিতে শক্তি বৃদ্ধি করা; অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতায় কর্মীরা শক্তিশালী হওয়া; কিছু ক্যাডারকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়ার মধ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্বের ছাত্ররাজনীতি ক্রিয়াশীল বলেই আমরা এখন দেখছি। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসমস্যা, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি,

www.pathagar.com

থাকা-খাওয়া, শিক্ষার উপকরণ, যাতায়াত, লেখাপড়ার নানা সমস্যার কোনোটিই ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দের মাথায় নেই, সেগুলো দেখার কথাও তারা ভাবে না। তাদের মূল লক্ষ্যই থাকে প্রতিপক্ষকে কোনোভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় হতে না-দেওয়া, নেতা-নেত্রী ও দলের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষকে সংগঠিত হতে না-দেওয়া। প্রয়োজনে তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া, কিল-থাপ্পড়, ঘুসি-লাথি মেরে হল থেকে বের করে দেওয়া, সরকারি দলের অঙ্গছাত্রসংগঠনের মূল কাজই হচ্ছে সরকার-বিরোধী কোনো আন্দোলন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন দানা বেঁধে না উঠতে পারে সেই দায়িত্ব পালন করা। যদি কোনোভাবেই সরকার-বিরোধী কোনো মিছিল বের হয় তাহলে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের 'নেতৃবৃন্দের' মূল কাজই হয়ে দাঁড়ায় এর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা, প্রয়োজনে ক্যাম্পাস থেকে তাদের বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করা। এটিকে কি ছাত্রজীবন বলে অভিহিত করা যায়?

বস্তুত সরকার এবং বিরোধীদলের দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ও চিন্তাভাবনা ছাড়া ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের অন্য কোনো কাজ নেই, লক্ষ্যও নেই। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ঐসব ছাত্রসংগঠনের পেছন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে চলছে। কিন্তু দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠাকারী ছাত্রসংগঠন নানাভাবেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিস্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করছে, তাদেরকে মিছিলে যেতে বাধ্য করছে। এটি এক অবিশ্বাস্য অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। যদি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকত তাহলে শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত চিত্রটি এখন যেমনটি দেখা যাচ্ছে তা না হয়ে অন্যভাবে দেখার সুযোগ ঘটত। সেটি দেখার পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। বাস্তবটা এমনই অবিশ্বাস্য পর্যায়ে চলে গেছে।

এ-ধরনের একটি পরিবেশেই ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। যারা এর আয়োজনের সঙ্গে ছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের চাইতে অনেক বেশি। বাস্তবধর্মী একথা স্বীকার করতে আমাদের দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তবে স্পষ্টই বোঝা গেছে সম্মেলনে সবার একটিই লক্ষ্য ছিল—একটি নেতৃত্ব তৈরি করা। যারা গত ২০/২৫ বছরের গতানুগতিক ছাত্ররাজনীতির ধারায় ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত ছিল তারা যে-কোনো উপায়ে একটি পদ লাভের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। পত্রপত্রিকায় আদুভাই বলে পরিচিত একটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বেশ আগে থেকে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সে-ধরনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও বেশ জোরেশোরে চলেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনা কোনো অছাত্রকে নেতৃত্বে নির্বাচিত বা মনোনীত না-করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ায় ছাত্রলীগের মধ্যেই দুটো ধারা তৈরি হয়ে যায়। একপক্ষে আদুভাইরা ও অন্যপক্ষে প্রকৃত ছাত্রকর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে। আদুভাইদের কেউ কেউ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে,

www.pathagar.com

সংগঠনের জন্য তাদের 'ত্যাগের' বিষয়টিকে সম্মুখে এনে সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নেতৃত্বের প্রচারণাও করা হয়েছে, অন্য ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তার কথাও বেশ বলা হয়েছে। যখন কিছুতেই তা দিয়ে শেখ হাসিনার মন গলানো গেল না, টলানো গেল না, তখন স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হল সেই 'অপরিহার্য নেতৃত্ব' যা ছাত্রলীগের সম্মেলনকেই প্রায় অনিশ্চিত এবং পণ্ড করে দিয়েছিল। সবাই প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে, সম্ভবত এরপর হয়তো আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব পিছু হটতে যাচ্ছে, আদুভাইদের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু আওয়ামীলীগ-নেতৃত্ব পিছুও হটেনি, আত্মসমর্পণও করেনি, বরং সিদ্ধান্তে অটল থাকল।

আওয়ামীলীগে নেতৃত্বের এইটুকু অনমনীয় ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের ফলাফল আমরা হাতেনাতেই পেলাম। ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যে দুজন লীগনেতা বিজয়ী হয়ে আসল, তারা উভয়েই ইতোমধ্যে মাস্টার্স শেষ করেছে, এমফিল গবেষণারত বলে জানা গেছে। আমি জানি না, ছাত্রলীগের এমন গুরুত্বপূর্ণ দুটো পদে থেকে তারা কীভাবে এমফিল গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাবেন, তবে তারা দুজন যে আদুভাই নন, তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রও নন—এটি বোঝা গেল,স্বস্তি পাওয়া গেল। এতবড় একটি সম্মেলন থেকে সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নির্বাচিত করা না-গেলেও যেটুকু করা গেছে তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখা উচিত হবে না। দেশের ছাত্রসংগঠনের নামে ছাত্ররাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন অবস্থা চলছে তাতে এটিকে একটি শুভসূচনাই বলতে হবে। এই শুভসূচনার পেছনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সদিচ্ছার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এই ঘটনা প্রমাণ করে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা থাকলে অনেক কিছুই জাতীয় জীবনে অর্জন করা সম্ভব। ছাত্রলীগের সম্মেলনের মাধ্যমে যা সূচিত হল তা যদি অন্যান্য সংগঠনও শুরু করে তাহলে দেশের ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রমে একটা পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে নিজ নিজ দল, অঙ্গসংগঠনের ভূমিকাকে গতানুগতিকভাবে আর নয়, বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেখার কথা বিশেষভাবে বলব। বিশেষত ছাত্রসংগঠনের কথাই বলব। দুনিয়ার কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এখন ছাত্ররাজনীতি বলে আলাদা কোনো বাস্তবতা বা ধারণার অস্তিত্ব নেই। ছাত্রসংগঠনগুলোরও চিন্তাভাবনায় দেশীয় রাজনীতি নয়, বরং শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চায় ছাত্রসমাজকে সাহায্য করা, সমৃদ্ধ হওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্তচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার আয়োজনে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য হয়ে ওঠাই মুখ্য হতে দেখা যাচ্ছে। সেভাবে ছাত্রসংগঠনগুলোকে বাড়তে দেওয়া হলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হাঙ্গামা, দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, চাঁদাবাজি, লুটপাট করতে

www.pathagar.com

কোনোভাবে সুযোগ না দিলে, লেখাপড়ার বাধ্যবাধকতায় ব্যস্ত রাখা হলে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেহারাই অন্যরকম হয়ে উঠবে—এতে সন্দেহ থাকার কিছু নেই। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর একটুখানি সদিচ্ছা যা পারে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্ত করতে, ছাত্রসংগঠনগুলোকে আদুভাই, আদুবিবি ও দুর্বৃত্তদের কবল থেকে মুক্ত করতে। দেশের রাজনীতিটাকেই এভাবে তার প্রকৃত চরিত্রে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া যায়।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হলে রাজনীতির সর্বক্ষেত্র থেকে দুর্বৃত্তদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিতাড়িত করতে হবে; সুস্থ স্বাভাবিক রাজনীতির চর্চাকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। একমাত্র দায়বদ্ধ, গণতান্ত্রিক মানসিকতার রাজনীতিবিদরা এর যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা মেনে নেবেন, উদ্যোগও নেবেন। কিন্তু সুবিধাবাদী, আদর্শহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং গণতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এর গুরুত্বকে লঘু করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন রাজনীতির ব্যাপক সংস্কারের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করছে। ছাত্রলীগের সম্মেলনে সেই সংস্কারের যেটুকু যাত্রা শুরু হয়েছে তাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে মূলদলে, জাতীয় রাজনীতির সর্বত্রও। তাহলে দেশ এবং জাতি চূড়ান্তভাবে লাভবান হবে।

১১ এপ্রিল ২০০৫, দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

হায়! ঢাকা কলেজ এবং দেশের ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা

মাত্র ২০-২৫ বছর আগেও ঢাকা কলেজের নাম উচ্চারিত হলে যে দুটি ধারণা আমাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠত তার একটি হচ্ছে দেশের সেরা, মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে লেখাপড়া করা এবং কিছু নামী-গুণী ও দেশখ্যাত শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করা, তাদের লেকচার শোনার সৌভাগ্য অর্জন করা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত কোনো স্কুলের যে-কোনো মেধাবী ছাত্রের কানেও ঢাকা কলেজের সেই সুনাম পৌঁছে যেত; ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার চিন্তা কমবেশি প্রায় সবার মধ্যেই নাড়া দিত, উদয় হত। আমি নিজেও মফস্বল এক স্কুলের ছাত্র ছিলাম গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো ফলাফল এসএসসিতে করার পর ইচ্ছে ছিল সেখানেই প্রথম ভর্তি পরীক্ষাটি দেব। নানা কারণে ঢাকায় আসা সম্ভব ছিল না, তাই সেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসে ঢাকা কলেজটি ঘুরে-ঘুরে দেখতে একদম ভুল করিনি। আমার মনে হয় বছর-বিশেক আগেও ঢাকা কলেজ সম্পর্কে দেশের মেধাবী ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদেরও প্রায় অনুরূপ ধারণাই ছিল। কিন্তু দেশের ছাত্ররাজনীতি থেকে আদর্শের করুণভাবে নির্বাসিত হওয়ার পর, গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে দলীয় রাজনীতির প্রভাব,তদ্বির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের প্রায় সবকটি কলেজের মতো ঢাকা কলেজেরও নামধাম হারিয়ে যেতে বসেছে; মেধাবী ছাত্রদের পদচারণা,গুণী শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ—এসব সুবচনও নির্বাসিত হয়ে গেছে। এখন ঢাকা কলেজের আশপাশ দিয়ে যখন যাতায়াত করি, মাঝেমধ্যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা কলেজের সংশ্লিষ্টতার কারণে যখন যাই, তখন এর সামগ্রিক অবস্থা দেখে শুধু মনে-মনে দুঃখ বা কষ্টই পাই না, বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার ভাবনাই আমাকে যেন ত্যাগ করতে হচ্ছে।

কী ভয়ানক স্বপ্নভঙ্গের কথা! ব্যাপারটি শুধু ঢাকা কলেজের ক্ষেত্রেই নয়, দেশের অন্যসব স্তরের চাইতে যেন কলেজশিক্ষা ব্যবস্থাটিই এখন বসে যাওয়া অবস্থায় বেশি পড়েছে। এর অসংখ্য কারণ আছে। সেসব কারণের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এ দেশে শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড এবং সর্বশেষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতা দিয়ে দেশের

www.pathagar.com

কলেজপর্যায়ের সকল (এইচএসসি, পাস, অনার্স, মাস্টার্স) শিক্ষাকে নরকে পাঠাতে যে-যার মতো ভূমিকা রেখে চলেছে। তাদের ব্যর্থতাই ঢাকা কলেজসহ সকল কলেজ শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করে তুলেছে। সরকার, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিকদল, ছাত্রসংগঠন যার-যার খবরদারিত্ব; কলেজ নিয়ে দলবাজি, দখলবাজি ইত্যাদি হুকুম পালন করা ছাড়া সরকারি-বেসরকারি কোনো কলেজেরই অস্তিত্ব এখন আর টিকে থাকতে পারছে না। লেখাপড়া করানো, শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত রাখা, আকৃষ্ট করা—এসব এখন শিক্ষাঙ্গনে আলোচিত শব্দ নয়, বরং অনেকটা নিষিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই কুফল গোটা দেশ এখন ভোগ করছে। ভবিষ্যতে আরো খারাপ কিছু যেন অপেক্ষা করছে—এর বাইরে ভিন্নকিছু ভাবব যে তেমন বাস্তবটা কোথায়?

সম্প্রতি ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্রদল-নেতা টাকা লুট করতে গিয়ে ধরাপড়ার পর ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস কারা দখল করে আছে, দখলবাজরা সেখানে ফেনসিডিল ব্যবসা, লুটপাট করে আনা টাকাপয়সার ভাগবাটোয়ারা, মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করা, ছাত্রনেতা নামধারীদের পাইকারি হারে চাঁদাবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়া, ফ্ল্যাট গাড়ি-বাড়ি কেনার নানা তথ্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শুরু করছে। বিষয়গুলো যে এতদিন গোপনীয় ছিল তা কিন্তু নয়। কেননা, ছাত্রদলের নেতারা ঢাকা কলেজের সম্মুখের ফুটপাতের দোকান থেকে শুরু করে আশপাশের মার্কেট ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চাঁদাবাজি করে এসেছে, ছাত্রাবাসে ছাত্রনেতারা 'রামরাজত্ব' কায়েম করে রেখেছে; ভিন্নমতের ছাত্রদের তাড়িয়ে দেওয়া, প্রহার করাসহ যেসব অপকর্ম করে আসছে তা রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, কলেজ প্রশাসন জানেন না—এটি ভাবার কোনো কারণ নেই। সবই যখন প্রকাশ্যে ঘটেছে, লুকোনোর তো কোনো অবকাশ থাকে না। তা হলে বুঝতেই পারেন, দেশ যারা চালাচ্ছেন তারা ঢাকা কলেজের লেখাপড়া নিয়ে আদৌ কখনো চিন্তা করেছেন কি? আমার জানা মতে, ঢাকা কলেজে সরকারের মন্ত্রী, এমপি, তাদের দলীয় নেতাদের স্ত্রী, আত্মীয়স্বজনদের পোস্টিং যতখানি গুরুত্ব পেয়েছে, কলেজটির সার্বিক শিক্ষার মান কীভাবে রক্ষিত হবে, উদ্ধার করা যাবে তা নিয়ে একবিন্দুও কেউ ভাবেন না।

ঢাকার সবকটি সরকারি কলেজের অবস্থা একই রকম। জোটসরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই সবকটি কলেজে বিএনপির ছাত্রদলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কলেজগুলোতে ভর্তি-বাণিজ্যের নামে ছাত্রদল অবৈধভাবে ছাত্রভর্তি করানো, অর্থোপার্জনে ব্যস্ত আছে—এটি তো দেশের পত্রপত্রিকাগুলো নিয়মিত প্রকাশ করছে। কলেজের ক্যান্টিন-ক্যাফেটরিয়া, হোস্টেল, শিক্ষক বদলি, তাদের পাঠদান ইত্যাদি হেন বিষয় নেই যার সঙ্গে ছাত্রনেতা-নামধারী

www.pathagar.com

নেতাকর্মীদের সম্পৃকতা নেই। এমনকি কোন্ দোকান থেকে কলেজের অনুষ্ঠানের মিষ্টি-আপেল কেনাকাটা করতে হবে, কোন্ অনুষ্ঠানে খাওয়ার কী মেন্যু হবে, কে কী বক্তৃতা করবেন—তাও এখন দখলকারী ছাত্রসংগঠনের-নেতাদের পরামর্শ নিয়ে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে অনুষ্ঠানও পণ্ড হবে, কেনাকাটাও লাটে উঠবে; কলেজের অধ্যক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অফিস ভাঙচুর হবে, তারা বদলিও হতে পারেন। এখন আপনারাই বলুন, ছাত্রসংগঠনের শক্তি যদি সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসহ সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে যায়; সরকার ক্ষমতায় আছে বলে ছাত্র নামধারী কিছু তরুণ যদি এমন 'বাদশাহি যুগে' ফিরে যেতে পারে,সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে; অবৈধ উপায়ে অর্থ, বিত্ত করতে পারে; ফ্ল্যাট কেনা, দুচারটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারে—তাদের জন্য দেশের আইন-কানুন পুলিশ র‍্যাব থাকবে কেন। রাজনৈতিক দলের নেতাদের যদি সক্রিয় সমর্থন পাওয়া যায় তাহলে এমন 'সম্পদ' আহরণের সুযোগ এই 'আদর্শহীন যুগে' কে ছেড়ে দেবে? এখন বিএ, এমএ পাস করে তাদের কে চাকরি দেবে? চাকরির জন্য তো নেতাদের কাছেই ধরনা দিতে হচ্ছে। পিএসসি, পুলিশ, শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব চাকরিতেই এখন বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি যেখানে বাধ্যবাধকতা হয়ে গেছে, সেখানে উঠতি বয়সের তরুণদের মধ্যে হতাশা ও সুবিধাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা না-বেড়ে উপায় থাকে না। কলেজে পড়তে এসে যখন একজন স্কুল-পাস-করা ছাত্র 'ভর্তি বাণিজ্যের' শিকার হয়, তখন সে প্রথমে বড়ধরনের হোঁচট খায়, তারপর হোস্টেলে একটি সিট পেতে যখন তাকে হাউস টিউটর নয় বরং ধরনা দিতে হয় ছাত্রশিবির, ছাত্রদলের অমুক ভাই, তমুক ভাইয়ের কাছে; কলেজে পড়তে হলে ছাত্রসংগঠনের মিছিল সমাবেশে যেতে হয়—তখন ছাত্রছাত্রীদের ছোটবেলার পাইলট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বড় বড় স্বপ্নের ইতি এখানেই ঘটে; এই পর্বে নতুন করে রাজনীতিবিদ হওয়া, এমপি, মন্ত্রী হওয়ার মধ্যে জীবন-জীবিকার চাকচিক্য তাদের নাড়া দেয়, আন্দোলিত করে।

শুধু এইচএসসি পড়ার ২ বছর যাদের কলেজে অবস্থান করতে হয়, একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সুযোগ তাদের অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু যারা একই কলেজে বিএ, এমএ ক্লাসে অবস্থান করে তারা এই সময়ে তাদের শিক্ষাগত ডিগ্রির কোনো অ্যাকাডেমিক মূল্য দেখে না, বরং এই সুযোগে বিত্ত ও রাজনীতিবিদ হওয়ার স্বপ্নই তাদের বড় হয়ে ওঠে, তাড়িতও করে। অধিকন্তু ঐসব কলেজে এখন আর প্রখর মেধাবী, নীতি-আদর্শে অটল তেমন খ্যাতিমান শিক্ষকের উপস্থিতি ক্লাসে কিংবা কলেজ-চত্বরে তাদের চোখে পড়ে না। যারা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে কলেজে পোস্টিং নিয়েছেন তাদের আচরণে, কথাবার্তায় ক্ষমতা আর দাপটই প্রাধান্য পায়। ঘরে কাজের বুয়া নেই, বাচ্চাকাচ্চার জ্বর-অসুখ-

www.pathagar.com

বিসুখের অজুহাত দেখিয়ে ক্লাস না-নেওয়া, পাঠদানে তেমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ না-রাখতে পারার বিষয়টি এখন খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যায়ে এককালের নামীদামি কলেজে এসেও তেমন নামীদামি ও খ্যাতিমান শিক্ষক পাচ্ছে না, অধিকন্তু এসব কলেজে 'কোচিং বাণিজ্য' বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ায় শ্রেণীপাঠদান ছাত্রছাত্রীদের জীবনবোধসহ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা বা পরিবর্তন নিয়ে আসছে না। এর ফলে সম্ভাবনাময় আমাদের বিরাট তরুণসমাজ শিক্ষার মূলধারাতে এসে নানাভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হচ্ছে; আদর্শ-বিবর্জিত রাজনৈতিক দলের ভাড়াটে হিসেবে কলেজ দখল, লুটপাটসহ নানা ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রকৃত শিক্ষিত নাগরিক থেকে; মেধাবী, সৎ ও আদর্শবান মানুষ থেকে। এর পরিণতিতে আগামী দিনে বাংলাদেশের কী হবে সবাইকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

২৬ জুন ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

এসএসসির ফলাফল : গ্রাম বনাম শহর, শহর বনাম শহরে বৈষম্য

গত ৯ জুলাই (২০০৫) ৭টি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি বোর্ড এবং মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি টিভি-চ্যানেলগুলোর কল্যাণে ঢাকা শহরের হাতে-গোনা ৪/৫ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উচ্ছ্বাস, মিষ্টি বিতরণের দৃশ্য সেদিন দেশের মানুষ ঘরে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছে। এই স্কুলগুলোকে নামীদামি এবং ভালো আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই ঢাকা শহরেই অসংখ্য স্কুল আছে—যেগুলোতে পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন নয়, কোনো কোনোটি আবার মন্দ নয়, ভালোই বলা চলে। দেখা যাচ্ছে বিরাট তারতম্য রয়েছে স্কুলগুলোর মধ্যে। আবার বাইরের শহরের স্কুলগুলোর কী অবস্থা—খুব বেশি জানা যাচ্ছে না। একটু-আধটু খবর নিলে দেখা যায় যে, প্রতিটি শহরেই যে-কটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যেই মানের তারতম্য ঘটছে। খুব মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি মধ্যম-আকারের শহরেও ৪/৫ টির বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের দিকে প্রবেশ করলে দেখা যাবে নামীদামি স্কুলের কথা এখন প্রায় ভুলে যেতে বসেছে সাধারণ মানুষ। অথচ বাংলাদেশে এখন সরকারি, আধাসরকারি, সম্পূর্ণ বেসরকারি, মিশনারি, বিশেষ ধরনেরসহ সব মিলিয়ে হাইস্কুলের সংখ্যা মোটেও ২০ হাজারের কম হবে না। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলকেই যদি স্কুলের ভালো-খারাপের মানদণ্ড ধরা হয় তাহলে ঢাকাশহরে আমরা বড়জোর ৩০/৪০টি স্কুলকে ধরতে পারব—যেগুলোর ফলাফল ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করছে। অথচ এই ঢাকাশহরে হাইস্কুলের সংখ্যা তো খুব-একটা কম নয়। আমার কাছে প্রকৃত তথ্য নেই। তাই অনুমান করে কিছু বলতে চাই না। তবে ঢাকাশহরে অবস্থিত স্কুলগুলোর পক্ষে ভালোভাবে চলা, মানসম্মত লেখাপড়া দেওয়ার সুযোগ যতখানি আছে, মফস্বল একটি শহরের তা নেই; গ্রামের কথা তো ভাবা কিংবা বলাই যায় না।

এ-বছরের ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, ৪০১ টি স্কুল থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি। অনুমান করি ৫-১০ শতাংশ পাস করেছে এমন স্কুলের সংখ্যা খুব-একটা কম নয়, হয়তো হাজার ছাড়িয়ে যাবে। তবে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলেই পাসের গ্রেডটি সচরাচর সি এবং বি-এর মধ্যে অবস্থান করে।

www.pathagar.com

যে ১৫ হাজার ৬৩১ জন ছাত্রছাত্রী জিপিও-৫ পেয়েছে তাদের সিংহভাগই ঢাকা শহরের নামীদামি কয়েকটি স্কুল, ক্যাডেট, বিভিন্ন শহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নামীদামি স্কুলেরই হবে। গ্রামাঞ্চলে জিপিএ-৫ লাভ করেছে এমন সৌভাগ্যবান স্কুলের সংখ্যা খুবই কম, কোনো স্কুল থেকে হয়তো এক-দুজনই তা লাভ করেছে—অনেকটা যেন ব্যতিক্রম হয়ে। জিপিএ-৫-এর বিষয়টি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। বছর বছর এর ওঠানামার মধ্যে অনেক তারতম; ঘটে—তা কিছুটা ঘটতেই পারে, কিন্তু এক বছর যা হয়েছে পরের বছর তার দ্বিগুণ বাড়া বা কমে যাওয়ার মধ্যে কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে।

যেমন, একটি কথা আমাকে বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী বলেছেন যে, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষাবোর্ডগুলোর মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ঘটে থাকে। কোনো কোনো শিক্ষাবোর্ডে প্রশ্নপত্র সহজভাবে প্রণয়ন করার লক্ষণ দেখা যায়, একইভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নেও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি একটু বেশি সদয় হওয়ার প্রচার থাকে। আবার কোনো কোনো শিক্ষাবোর্ডে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ভুলভ্রান্তি অথবা একটু-আধটু কঠোর মনোভাব বিরাজ করে। বস্তুত প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীরা একই সময় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলেও তারা পরীক্ষায় অংশ নেয় ৭টি পৃথক শিক্ষাবোর্ডের পৃথক প্রশ্নপত্রের অধীন। এ বছরই দেখুন না, যশোর বোর্ডের পাসের হার ৬৯.১৯%, রাজশাহী বোর্ডের তা ৪৩.১৩ শতাংশ। ফলাফলের এত বিরাট পার্থক্যের কারণ কী? যশোর বোর্ডের স্কুলগুলোর খবর নিলে দেখা যাবে—অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাচ্ছে, হৈহুল্লোড় করছে। অপরদিকে এখন রাজশাহী অঞ্চলে গেলে দেখা যাবে গ্রামের তো দূরে থাক, শহরের স্কুলগুলোতেও পাসের হার যথেষ্ট কম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেই কোনো আনন্দ, উচ্ছ্বাস; বরং কান্নাকাটি ও বিষণ্নতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। যদি ঢাকা বোর্ড এবং রাজশাহী বোর্ডের মধ্যে ফলাফলের এই তারতম্য ঘটত তাহলে কিছুটা বোঝা যেত। কেননা ঢাকাশহরের বেশকিছু স্কুলের পাসের হার শতভাগ কিংবা এর খুবই কাছাকাছি অবস্থান করছে। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ৫২ দশমিক ৮৫ শতাংশ। অথচ যশোর বোর্ডের হার তো শতকরা ৭০-এর কাছাকাছি। পাসের এত ব্যাপক তারতম্য ঘটার বিষয়টিকে বক্রভাবে নিচ্ছি না সত্য, কিন্তু প্রশ্ন তো উঠতে পারে : পরীক্ষার ফলাফলই যদি ভালো ছাত্র, ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়ে থাকে তাহলে এ-বছর বোধহয় তা বেশি আছে একমাত্র যশোর বোর্ডেই, আগামী বছর তা হয়তো অন্য শিক্ষাবোর্ডে চলে যাবে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য, মেনে নেওয়ার মতো?

অথচ আমরা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনেক কথাই বলি। একটু খারাপ হলে ফলাফল বিপর্যয় হয়, বেশি ভালো হলে বলি শিক্ষার মান বেড়েছে। এর

www.pathagar.com

কোনোটির ওপরই আমার ভরসা, বিশ্বাস বা আস্থা রাখার বাস্তবসম্মত কারণ নেই বা থাকছে না। কেননা, অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন, বিদ্যালয় নিয়ে হাজাররকমের নিয়ম-অনিয়মের খেলা, জোড়াতালি দেওয়া, পরীক্ষাপদ্ধতিতে নানাধরনের দোষত্রুটিকে জায়েজ করে নেওয়া, প্রতিবছর পরীক্ষাপদ্ধতিসহ নিয়ম-নীতির পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে চলছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। ওদেরকে গিনিপিগ বানাতে বোর্ড এনসিটিবি সবসময়ই লেগে আছে। এমন অবস্থার মধ্যদিয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, অবশেষে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের পাস-ফেল অনেকটা বোর্ডের অদৃশ্য হাতের (প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ধরন-ধারণই বলা হচ্ছে) ওপর নির্ভর করছে। ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যে, যায় এক বোর্ড ভালো করেছে তো অন্য বোর্ড খারাপ করেছে। এ-ধরনের ভালো-খারাপের ভিত্তিটাই তো দুর্বল ও নড়বড়ে। কয়েক যুগ ধরে পাবলিক পরীক্ষার নামে আমাদের দেশে এমন একটি ব্যবস্থাই তো চলে এসেছে। আমরা এই ব্যবস্থা থেকে দ্রুত অন্য ব্যবস্থায় যেতেও পারব না, আবার বর্তমান ব্যবস্থা থেকে মেধার একটি গ্রহণযোগ্য পরিমাপও নির্ধারণ করতে পারব—তাও মনে হচ্ছে না।

আমরা অনেক কষ্টে ২০০০ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করেছি। এটিকে নানাভাবে এখন যোগ-বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে আমরা আপাতত একটা স্থির অবস্থানে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু ৩/৪ বছর আগে যখন গ্রেডিং পদ্ধতি সবে যাত্রা শুরু করেছিল তখন জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। এ বছর তা ১৫ হাজার ৬৩১ জনে উন্নীত হয়েছে। এখানেও অস্বাভাবিকতা আছে। প্রতি বছর ফলাফল একই সমান হবে তা কোনো মূর্খও দাবি করে না, কিন্তু তারতম্যের মধ্যে যদি শতকের ঘর আর কয়েক হাজারের ঘরে ওঠানামা করে, তাহলে পরবর্তী শিক্ষাজীবনে কেউবা বেশি সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে, কেউবা যথার্থ সুযোগপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মনে হয় আমাদের দেশে পাবলিক পরীক্ষায় এমনটি ঘটছে খুব বেশি-বেশি। এটি না-হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। যে-ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতিতে এমনটি ঘটে থাকে তার ওপর নির্ভর বা আস্থা রাখা বা সেটি নিয়ে বেশি উৎসাহের কিছু নেই।

শিক্ষার মানের বিষয়টি প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল দেখে চট করে বলে দেওয়া বা নির্ধারণ করাটা মোটেও সঙ্গত হবে না। হ্যাঁ, নকল ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় বা হ্রাস পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাসের জন্য হলেও লেখাপড়া কিছুটা হলেও করতে হচ্ছে। তবে এটি নিতান্তই পরীক্ষা পাসের জন্য। মানসম্মত লেখাপড়া এখানে খুঁজতে গেলে খালিহাতে ফিরে আসতে হবে। মানসম্মত লেখাপড়ার পেছনে থাকতে হবে একটি বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের কর্মযজ্ঞ। সেটি ঘটলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্তমানের মতো এত আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিরাজ করতে পারার কথা নয়। তাতে

www.pathagar.com

বইপুস্তকের মান যেমন থাকবে, শিক্ষকের বিষয়গত জ্ঞান ও দক্ষতাও প্রায় কাছাকাছি মানে থাকতে বাধ্য বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কি এখন এগুলোর একটিও সামান্যতম মান নিয়ে শিক্ষার কোনো স্তরে, কোনো প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছে? যতই আমরা নামীদামি স্কুলের ঢাকঢোল পেটাই না কেন, বাছাই করে প্রস্তুত করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়ে ৪/৫ জন টিউটর ও ব্যাচটিউটরকে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো করার জন্য প্রস্তুত করার নাম মোটেও মানসম্মত শিক্ষা নয়। যদি মানসম্মতই হবে, তবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর জিপিএ বা ফলাফল নিয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই কেন পরবর্তী শিক্ষাজীবনে গিয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে বা টিকিয়ে রাখতে পারে না তা ভেবে দেখতে হবে।

লেখাপড়ার বিষয়টিকে অত হালকা বা সরলভাবে দেখলে হবে না। আমরা যুগ যুগ ধরে সেভাবেই দেখে এসেছি। আমাদের অভ্যস্ততাও হয়ে গেছে একরৈখিক চিন্তাভাবনায়, অধিকন্তু হাতের কাছে যা-কিছু আছে, যা-কিছু দেখি—তাকে নিয়েই প্রকল্প তৈরি করি, প্রতিষ্ঠান গড়ি, এমনকি বিদ্যাশিক্ষাকেও সেই মানদণ্ডে মূল্যায়ন করি। এসব ধারণা, মত, বিশ্বাস ও প্রচারণার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলব, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটিকে আর এভাবে নয় বরং আধুনিক বিশ্বের মতো করে দেখতে শিখুন, গড়ে তুলতে চিন্তা করুন। নতুবা লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেলেও শেষপর্যন্ত সৃজনশীল যথার্থ মেধাবী ও শিক্ষিত মানুষ গড়ে-তোলা আমাদের পক্ষে তেমন একটা হবে না, যেমনটি এ-পর্যন্ত আমরা বেশি পারিনি। দারুণ বৈষম্য বিরাজ করছে সর্বত্র, একই শহরেই তারতম্য হচ্ছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেই তারতম্য দিনদিন পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহের মতো দূরসম হয়ে উঠছে। কে ঘোচাবেন সেই দূরত্ব? কীভাবে তা সম্ভব—কেউ জানেন না; ভবিষ্যতে জানাবেন সেই ভরসাও খুব একটা দেখি না। কিন্তু এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে, বাঁচতে হলে আমাদের বেঁচে থাকার মতো মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতেই হবে।

www.pathagar.com

ইডেন এবং দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার হালচাল

বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবর বলতে গেলে দেখাই হয় না, তাই সেটিতে কখন কী প্রচারিত হয় তা বলতে পারব না। তবে বেসরকারি সবকটি টিভি চ্যানেল ১৪ মার্চ (২০০৫) দিন ও রাতভর তাদের নির্ধারিত সংবাদ অনুষ্ঠানে রাজধানী ঢাকা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইডেন মহিলা কলেজে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের ছাত্রীনামধারী ক্যাডারদের হামলার ভয়াবহ বেশকিছু দৃশ্য বারবার দেখিয়েছে। পরদিন পত্রপত্রিকাগুলোর প্রধান বা পার্শ্বপ্রধান খবরের শিরোনামও হয়েছিল এটিই। দেশবাসী মিডিয়ার কল্যাণে সেই লজ্জাজনক খবরটি হয় শুনেছেন, নতুবা ছবি বা দৃশ্য দেখেছেন। জানি না, কার কেমন অনুভূতি হয়েছিল; তবে টিভির পর্দায় কিংবা পত্রপত্রিকার এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখতে আমার কষ্ট ও লজ্জার অন্ত ছিল না। আমি বারবার তাকাচ্ছিলাম আমার কলেজ ও স্কুলপড়ুয়া দুই সন্তানের দিকে, ওরাও আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আমার মনে হয় সারাদেশেই অভিভাবক এবং সন্তানদের অনুভূতি এমনই অসহায় এবং লজ্জাজনক ছিল। বিশ্বাস করুন, ছাত্রীনামধারী কতিপয় ছাত্রদল-ক্যাডারকর্তৃক অসহায় মেয়েদের কিল,ঘুসি, চুল ধরে টানাটানি, মাটিতে ফেলে দিয়ে লাথি মারা, লাঠিপেটা করার দৃশ্য, তার পাশে কিছু পুরুষ (জানি না তারা শিক্ষক কিনা), পুলিশদের দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য দেখে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল পৃথিবীর কোনো বনজঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিই, অথবা আমার সম্মুখের মাটি যদি তখনি দুভাগ হয়ে যেত, তাহলে মাটির নিচে মুখ লুকাতাম, সম্ভব হলে চাপা পড়ে সেই সময়ই মাটির সঙ্গে মিশে যেতাম; তবুও এমন বর্বর, অসভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার কথা কল্পনা করতাম না। এতটাই কষ্ট, ক্ষোভ, ঘৃণা, লজ্জা, অপমান আমাকে সেদিন আক্রমণ করেছিল। আমি টিভি-চ্যানেলে একবার খবরের দৃশ্যটি দেখার পর দ্বিতীয়বার আর দেখিনি, পত্রিকার পাতায় ছাপা ছবিও একবারের বেশি দেখিনি, প্রতিবেদনগুলোও মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারিনি; পড়তে লজ্জা, ক্ষোভ ও কষ্ট হচ্ছিল।

দেশবাসীর মতো আমি অপেক্ষায় ছিলাম ঐ হামলার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল, সহযোগিতা করেছিল, দর্শকের ভূমিকার যেসব পুলিশ কর্মকর্তা দাঁড়িয়েছিল; সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কী

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা দেখা এবং শোনার। না, এ-পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যারা সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে টিভি-ক্যামেরার সম্মুখে 'বীরদর্পে' সাধারণ ছাত্রীদের এভাবে মারধোর করল; আহত করল, তাদের ধরা, শাস্তি দেওয়া, তিরস্কার করা, সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা, র‍্যাবের হেফাজতে নেওয়া (ক্রসফায়ার আমি সমর্থন করি না) ইত্যাদি কোনো সংবাদই চোখে পড়ছে না। যে ছাত্রদলের নাম টিভি-চ্যানেলগুলোর সংবাদে উচ্চারিত হয়েছিল, পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছিল; সেই ছাত্রদল শুধু একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, ঐ কলেজে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত, সুতরাং যারা ঐসব কর্মকাণ্ড করেছে তারা তাদের নিজ দায়িত্বে করেছে। এর সঙ্গে তাদের সংগঠনের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। তাহলে আমাদের প্রশ্ন : পুলিশ প্রশাসন কেন সেসব ক্যাডারকে পাকড়াও করছে না? আসলে ঐসব যুক্তির কথা মনে হচ্ছে বাংলাদেশে এখন সম্পূর্ণরূপে অচল। যার যা-খুশি তা বলতে পারবে, করতে পারবে—যদি সরকারের মৌন সমর্থন থাকে তাহলে তাকে বা তাদের ধরা, শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি মোটেও সহজ নয়। সরকারের বিশেষ কোনো স্থান থেকে বলা হলেই তবে পুলিশ বাহাদুররা নড়েচড়ে বসেন, নতুবা তারা ডিউটি(!) পালন করেন—এর বেশিকিছু নয়।

এ তো গেল সরকারের কথা। সরকারের বাইরে অন্য যারা আছেন তাদের প্রতিক্রিয়া কী? প্রধান বিরোধীদল ঐ হামলার প্রতিবাদ করেছে। যেহেতু সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের ক্যাডাররা হামলা করেছে, তাই প্রধান বিরোধীদল এর প্রতিবাদ করেছে, নিন্দা করেছে—এটিই ধরে নিচ্ছি। তবে তাদের ছাত্রসংগঠনের ক্যাডাররা এমন নারকীয় তাণ্ডব ঘটালে তারা কী বলতেন, করতেন—তা আমরা জানি না। তবে তেমনি হলে সরকারি দলের বিশেষ বাহিনীর ধরপাকড় অভিযান, রিমান্ডে নেওয়ার তৎপরতা নিশ্চয়ই এতদিন চোখে পড়ত। গোটা দেশে ছাত্রলীগের ওপর হামলা, ধরপাকড় শুরু হয়ে যেত। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজে নানা স্লোগান-সংবলিত ব্যানার নিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ঐ হামলার প্রতিবাদ করছে, একটি নারীসংগঠন ছোটখাটো একটি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। সাধারণভাবে আর কী দেখা যাচ্ছে? যারা বিএনপি করেন, বিএনপিকে সমর্থন করেন—তারা এ নিয়ে কোনো কথা বলেন না, বিএনপির কোনো কাজেরই সমালোচনা করা যাবে না। যারা কোনো রাজনৈতিক দল করেন না, তারাও কিছু বলেন না। সবারই একটি কথা : বলে কী হবে, যেদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে মিথ্যাকথা বলা হয়; যেদেশে পুলিশ একজন ভদ্রমহিলাকে পিটিয়ে প্রেসবিজ্ঞপ্তি দিয়ে মিথ্যাকথা বলতে পারে, দোষ স্বীকার করে না, ক্ষমা প্রার্থনা করে না; যেদেশে বিরোধীদল রাস্তায় মিছিল বের করলেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়, পুলিশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়; যেদেশের রাজনীতিবিদরা অনর্গল মিথ্যাকথা বলেন, পুলিশ-র‍্যাব দিয়ে মিথ্যাকথা বলানো হয়, অন্যের ওপর দোষ

www.pathagar.com

চাপিয়ে নিজে সাধু সাজেন; যে দেশে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রসংগঠনকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় দখল করার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে; ছাত্রসংগঠনের সকল অপকর্ম, দখলদারিত্ব, হত্যা-নির্যাতন, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, লুটপাট, অশিক্ষা-কুশিক্ষা অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে—সেদেশে ছাত্রছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আসবে, জ্ঞানীগুণী, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ হবে—এমন ভাবাটাই মনে হচ্ছে মস্তবড় অপরাধ!

বাংলাদেশে এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা দলীয় ক্যাডার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করে তারাই 'সিট বাণিজ্য', 'ভর্তি বাণিজ্য', 'টেন্ডার বাণিজ্য', 'খাদ্য বাণিজ্য করতে পারে; টাকা-পয়সা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি, গাড়ি, ঘর-সংসার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই অর্জন করতে পারে। ভবিষ্যতে এমপি, মন্ত্রীসহ হর্তাকর্তা হতে পারে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিএসসির সহ সবধরনের তথাকথিত পরীক্ষা দিয়ে চাকরি বাগিয়ে নিতে পারে, দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কষ্ট করে কে লেখাপড়া করবে? সুতরাং যারা বাংলাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষার স্থান বলে এতদিন ভাবতেন, বিশ্বাস করতেন—তাদের বলব সেসব বহু অতীতদিনের কথা, মিউজিয়ামে যত্ন করে রেখে আসার কথা; সেকথাগুলো এখন ভুলে যেতে হবে। এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি আপনার ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি সরকারি ছাত্রসংগঠনের ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসেন তাহলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন তাদের রাজা-রানীর হালে চলবে। তারা কলেজে যাবে সরকারি দলের মিছিল করতে, প্রয়োজনে দুচারটা বক্তৃতার নামে গলাবাজি করবে, গালমন্দ করবে, প্রতিপক্ষকে গালাগালি করবে, হল দখল করবে, বিরোধীদেরকে পেটাবে; লাথি, কিল,ঘুসি মারবে; অল্প কিছুদিনের মধ্যে আপনার সন্তান "ছাত্র' শব্দটির সঙ্গে 'নেতা' উপাধিটিও অর্জন করবে। যদি আপনার সন্তানটি মেয়ে হয়, তাহলে সে 'ছাত্রীনেত্রী' উপাধি লাভ করবে। তাকে ৫০/১০০জন সহপাঠী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, উপাচার্যসহ সবাই 'নেতা' 'নেত্রী' বলে সম্বোধন করবে। 'নেতা' 'নেত্রী'রা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মীদের গণহারে চা-শিঙাড়া খাওয়াবে। সেই চা ও শিঙাড়ার পয়সা দোকানি চাইবার সাহস রাখেন না। আমাদের এসব 'নেতা', 'নেত্রী'রা হোস্টেলে সিট দেওয়া, ছাত্রভর্তি করা, ট্রান্সফার করা সহ সকল ক্ষেত্রে তদবিরের একটি চেইন অফ কমান্ড, সিন্ডিকেট তৈরি করে রেখেছে; সেখানে সবাইকে টাকা ঢালতে হবে। অধ্যক্ষ মহোদয় ঐসব 'নেতা', 'নেত্রী'কে চেয়ার এগিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, বাবা, মা বলে সম্বোধন করছেন; কোথায় তাদের চাঁদার নামে কী ফরমান আসছে তা পূরণ করছেন। নতুবা বদলি, হয়রানি, মূল রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নালিশ যাচ্ছে, সেই নালিশ এবং অভিযোগের পরিণতি কী হতে পারে তা কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষকই জানেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এখন সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। সব হলের নিয়ন্ত্রণ ঐসব ছাত্রসংগঠনের হাতে। গ্রাম বা অন্য শহর থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা হলে উঠছে প্রথমত ছাত্রসংগঠনের 'কৃপায় ও দয়ায়'। এর জন্য বিকিয়ে দিতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন সত্তাকে, তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে মিছিলে যেতে, সভা-সমাবেশে যেতে। কেউ আপত্তি করলে তার ওপর নেমে আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, রাজনৈতিকভাবে হয়রানি। প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠন (এ মুহূর্তে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির তা করছে, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে দৃশ্যপট হয়তো পাল্টে যাবে) লেখাপড়া বাদ দিয়ে দিনরাত দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে আসছে। টেন্ডারবাজি, টাঁদাবাজি অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের মারধোর করা, তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের একমাত্র কাজ হয়ে পড়েছে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া? এমন প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু বলতে হবে : না, সত্যিকারের লেখাপড়া বলতে আমি যেটি বুঝেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি, আমি আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে সেটি এই বাংলাদেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে দেখেছি। এখানে লেখাপড়ার কথা উচ্চারিত হলেও গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত লেখাপড়ার কোনো আয়োজন নেই। স্কুলশিক্ষার কথা প্রসঙ্গক্রমে নাইবা বললাম। কিন্তু আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষারই আমি কোনো আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম বাস্তবে খুঁজে পাই না। এখানে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মূল চেষ্টাটা থাকে পরীক্ষা পাসের এবং সার্টিফিকেট প্রদানের, অর্জনের। কী করে পরীক্ষায় পাস করা যাবে—সেভাবে লেকচার দিন, পরীক্ষার প্রশ্ন করুন, নম্বর দিন, পরীক্ষার ফল ঘোষণা করুন। ব্যস্! কী শিখল, বাস্তবজীবনে এই শিক্ষার প্রয়োজন কতটুকু আছে, কীভাবে এই শিক্ষাকে জীবন ও কর্মমুখী করতে হবে, বিশ্বব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী অগ্রগতি এসেছে, এসব কি পুরোনো হয়ে গেছে, নতুন চিন্তা কী—ওসব বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিন। ওসব বড় চিন্তা নিয়ে ভাববার জন্য পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়ে গেছে। আমাদের ওসবের প্রয়োজন নেই। আমাদের ডিগ্রি দেওয়া এবং সার্টিফিকেট নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সার্টিফিকেট হলে সমাজে আমি 'শিক্ষিত' বলে দাম পাব, রাজনীতিতে এমপি, মন্ত্রী হতে প্রতিযোগিতায় একটি প্লাসপয়েন্ট যোগ করতে পারব, বিয়েশাদিতে পণ নেওয়ার দর-কষাকষিতে যেতে পারব।

বিদ্যা দিয়ে আমার কী কাজ? চাঁদে আমার যাওয়ার দরকার নেই। তাতে অনেক আগেই মার্কিনিরা চলে গেছেন, মহাকাশেও তারা এবং রুশরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার দেশে বিদ্যার দরকার নেই। সার্টিফিকেট হলেই হবে। কেননা, বিদ্যা অর্জনের আগেই আমি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাধরনের 'বাণিজ্য'

www.pathagar.com

করে কাঁড়িকাঁড়ি অর্থোপার্জন করতে পারি, করে রেখেছিও; সেই টাকা দিয়ে এখন প্রাইভেট ক্লিনিক, প্রাইভেট কোচিং সেন্টার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, প্রোডাকশন হাউজ—কী না চাই—একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দিলেই এদেশের পাবলিক মাছির মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে! টাকা, টাকাই সকল শক্তির উৎস; ক্ষমতাও এখন এই টাকার কাছে বন্দি হয়ে গেছে। চুরি-চামারি, বাটপাড়ি,কালোবাজারি, ঘুস, দুর্নীতি—ওসব কেতাবি কথা, লেখাজোখার কথা। কিছুসংখ্যক মানুষ ওসব করেই যাবে, খাবে। কিন্তু টাকা বানানোর যে-বিদ্যা আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে পেরেছি, পৃথিবীর আর-কোনো দেশ-জাতি পারেনি—তার ফলে জাতির ছেলেমেয়েরা আর না-খেয়ে তো মরবে না! শুধু তাদেরকে পুরোনো মূল্যবোধটা একটু ত্যাগ করতে হবে, লেখাপড়া করার কথা ভুলে যেতে হবে, চিরকালের সরকারি ছাত্রসংগঠন করতে হবে, যারা উহ্-আহ্ করবে তাদেরকে 'সমুচিত শিক্ষা' দিতে হবে, মিছিল-মিটিং করতে হবে—যত ধরনের 'বাণিজ্য' কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গজিয়ে উঠেছে, উঠছে—এগুলোতে মন ও হাত পাকাতে হবে।

বই-পুস্তকের কোনো প্রয়োজন নেই। গাইড বই, নোটবই, ফটোকপি সংগ্রহ করে পরীক্ষার আগের এক রাতে দেখে নিলেই কেল্লাফতে! পরীক্ষায় কী প্রশ্ন আসবে, তা কে না জানে? খাতায় প্রশ্নের সঙ্গে কিছুটা মিল রেখে কিছু-একটা লিখে আসতে পারলেই হবে। তাছাড়া এখন যেভাবে দলীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে—তাতে পীরক্ষায় শুধু পাস নয়, প্রথমশ্রেণী পাওয়ার বিষয়টিই দলীয় ক্যাডার ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় হয়ে উঠছে। দেখুন না, ৫০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে ৪৯ জন কীভাবে প্রথমশ্রেণী পেতে শুরু করেছে? মনে রাখবেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর আর-কোনো দেশ বা জাতি ভেঙে তছনছ না-করতে পারলেও আমরা সেটির বেশিরভাগই ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে এনেছি। কেননা, আমরা শুধু ছাত্র নয়, হাজার হাজার 'ছাত্রনেতা' তৈরি করছি; আমরা শুধু শিক্ষক নয়, ভূরি ভূরি 'শিক্ষক নেতা' বানিয়ে ফেলছি। কারণ আমাদের দেশটি এখন 'নেতা' 'নেত্রী'র দেশ হয়ে পড়েছে। নেতানেত্রী কীভাবে তৈরি হয়, তার ট্রেনিং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে নেওয়া হয়, দেওয়া হয় তা ইডেনে সামান্য নমুনা দেখেছেন মাত্র—তা নতুন করে বলার বেশি প্রয়োজন নেই। তবে এদেশ অদূর ভবিষ্যতে যে মেধাশূন্য এবং মননশীল আদর্শবাদী-মানুষশূন্যও হয়ে পড়বে সে-ব্যাপারে আমার আশঙ্কা এখন বদ্ধমূল হয়ে উঠছে। এমনটি না-দেখে মরতে পারলেই শান্তি পাব। জানি না সেই ইচ্ছা আমাদের আদৌ পূরণ হবে কি?

১৯ মার্চ ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রম নানামুখী সংকটের পদধ্বনি

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এর ফলে আগামী বছর থেকে স্কুলপর্যায়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বলে আলাদা কোনো শাখা থাকবে না; সব শিক্ষার্থীই বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখার বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করার সুযোগ পাবে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভাগ বাছাইয়ের সুযোগ পাবে। স্কুলপর্যায়ে আগামী বছর থেকে চালু হতে হওয়া একমুখী শিক্ষাক্রমের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পরিপত্র এরই মধ্যে জারি হয়েছে, একমুখী শিক্ষাক্রমের অধীনে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রক্রিয়া প্রায় শেষপর্যায়ে রয়েছে। গত ২২ আগস্ট এ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বেশকিছু কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এর একটিতে উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। একমুখী শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্রও আমি সংগ্রহ করেছি। সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, এ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কমবেশি কিছু ধারণার আলোকে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করেই লেখাটি লিখছি।

প্রথমেই বলে রাখি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রমের ধারণার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সমর্থন থাকার যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমিও মনে করি স্কুলপর্যায়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের প্রচলন আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করেছে, পিছিয়ে দিয়েছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মৌলিক ধারণার অভাব তাই স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখার মৌলিক কিছু সমন্বিত শিক্ষাক্রম স্কুল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক থাকলে পরবর্তী শিক্ষা অথবা কর্মজীবনে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতে পারে। উন্নত দুনিয়ায় স্কুল পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মানসগঠনে সমন্বিত শিক্ষার ধারণাই কার্যকর আছে। তাদের পাঠক্রম, স্কুলশিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে ওঠে। স্কুল-পরবর্তী উচ্চশিক্ষা লাভে ছাত্রছাত্রীরা বিষয়-নির্বাচনের মাধ্যমে নিজস্ব পছন্দ ও

www.pathagar.com

সন্তুষ্টিকে এভাবে অর্জন করে থাকে। সেক্ষেত্রে স্কুলপর্যায়ের পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের সহায়কই হয় বেশি।

আমাদের দেশে স্কুলপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিভাগ-নির্বাচনের ব্যবস্থাটিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বিষয় ও বিভাগ নির্বাচন এবং উচ্চতর লেখাপড়ায় এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়, অধিকন্তু মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে বিপর্যকর অবস্থা বিরাজ করছে। যে ছাত্রের পড়া উচিত ডাক্তারি, সে পড়ছে ইসলামের ইতিহাস; যার পড়া উচিত দর্শন নিয়ে, সে ভর্তি হয় এমন একটি বিষয়ে যা সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। যে ছাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে এসেছে, উচ্চশিক্ষায় তার স্থান হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা ইসলামের ইতিহাসের মতো বিষয়ে। অধিকন্তু দেশের মানবিক বিভাগে যে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে তারা এই বিভাগে পড়ে কারণ তাদের বেশির ভাগই গণিত, পদার্থ, রসায়ন, কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে তেমন একটা দক্ষতা অর্জন করেনি। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা লাভ ছাড়া মানবিক বিভাগে পড়াশোনা করে কেউ কেউ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, এমনকি উচ্চতর পর্যায়ে কোনো বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন; কিন্তু তাদের সেই উচ্চতর ডিগ্রি কতটা জ্ঞানবিজ্ঞানের যথার্থ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আবার ডাক্তার, প্রকৌশলীসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সমাজ ও মানুষের অবস্থানটিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্যসহ মানবিক শাখার বিভিন্ন বিষয়ের পঠনপাঠনকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এইসব বিবেচনা থেকেই স্কুলপর্যায়ে একমুখী তথা সমন্বিত লেখাপড়ার প্রথা উন্নত দুনিয়ায় এখনো বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত স্কুলে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে বহুমুখী প্রথা চালু করা হয়। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২০০৩ সালে মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষাকমিশনে স্কুলপর্যায়ে একমুখী শিক্ষাক্রম চালুরই সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীও বর্তমানে এই পদ্ধতি চালু করার পেছনে ২০০৩ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে আমরা এ-পর্যন্ত জানতে পারিনি সরকার ঐ শিক্ষানীতি গ্রহণ করার কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে কিনা। বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারই একটি করে শিক্ষাকমিশন গঠন করে থাকে। তবে অভিজ্ঞতা বলছে, এইসব কমিশন গঠন করার পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য মনে হয় কোনো শিক্ষানীতি গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা নয়। দেশে একটা শিক্ষানীতি হতে যাচ্ছে—এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার তার মেয়াদ শেষ করতেই সচেষ্ট থাকে। কোনো সরকারই জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ গ্রহণ করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়

www.pathagar.com

অর্থ খরচ করেনি, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়নি, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোনো শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হবে তেমন স্বপ্ন দেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ২০০৩ সালের শিক্ষাকমিশনের প্রসঙ্গ টেনে একমুখী শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের যে-কথা উল্লেখ করেছেন তা আমাদের কাছে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ঐ শিক্ষাকমিশনের প্রতিবেদন সরকার গ্রহণ করেছে কিনা তাই তো দেশবাসী জানে না। তা ছাড়া ঐ কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে দেশে কিছুদিন বাদ-প্রতিবাদও যথেষ্ট করা হয়েছিল। সম্ভবত সে-কারণেই মনিরুজ্জামান-কমিশনের প্রতিবেদনও বাদ পড়েছে। তেমনটিই আমরা জানি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, কীভাবে বিন্যস্ত হবে, কীভাবে ভবিষ্যৎ কাঠামো দাঁড় করানো হবে—সামগ্রিক তেমন একটি পরিকল্পনা ছাড়া নবম-দশম শ্রেণী, অথবা মাধ্যমিক স্তরে একটি পরিবর্তন আনার চিন্তা ১৯৬২-১৯৬৩ সালের মতোই একটি বড়ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করা ছাড়া প্রকৃতই কোনো সুফল বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখি না।

সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত মোতাবেক চালু হতে যাওয়া একমুখী শিক্ষাক্রম আগামী বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকল মহল। এরকম একটি ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তুতি গ্রহণ এবং নিচের ক্লাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন সাধন একান্তই অপরিহার্য বলে মনে করছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও অর্থনীতিবিষয়ক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো নিচের ক্লাসে লাভ করে আসতে পারে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল জটিল বিষয় ও ধারণাই প্রাঞ্জল ও জীবনঘনিষ্ঠভাবে বইপুস্তকে উপস্থাপন করতে হয়—শিশু থেকে কিশোর ও যুবক শিক্ষার্থীরা যাতে বয়স ও শ্রেণীভেদে ঐসব পাঠ থেকে যথার্থই শিক্ষালাভ করতে পারে, বুঝতে পারে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের ধারণাই এখনো গতানুগতিক, পুরোনো এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শিশুমনের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও প্রাণোচ্ছল প্রয়াসকে যেমনিভাবে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করতে হয়; একই সঙ্গে প্রকৃতি, মানুষ ও বাস্তবজীবনের রহস্যগুলোকেও যুক্তি, বুদ্ধি এবং মননশীলতায় গড়ে তুলতে হয়। তবেই শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিতে পারে। সেই উদ্যাগ আমাদের স্কুলে পাঠ্যপুস্তকে তেমন সবল নয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষকের দারুণ অভাব। বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাব কতখানি প্রকট তা সকলেরই জানা কথা। ফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষ অতিক্রম করে উপরে উঠে আসলেও মানসম্মত শিক্ষালাভ থেকে তারা প্রায় বঞ্চিতই থাকে। এরা বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা দক্ষতার জ্ঞান খুব বেশি পায় না। এই বেশির ভাগ (শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ) শিক্ষার্থী মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়। মূলত গণিত ও

www.pathagar.com

বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষায় দুর্বলতার কারণেই তাদের মানবিক বিভাগে স্থান করে নেওয়া। বিজ্ঞান ও বাণজ্য বিভাগ নিয়ে স্কুলে এখনো পর্যন্ত শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে না। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ঐ হারটি আরো কমে যায়, স্নাতক পর্যায়ে তা একেবারেই হতাশজনক পর্যায়ে চলে আসে। এর কারণ হচ্ছে যারা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের মধ্যেও বিরাট একটি অংশ মানসম্মত বিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষালাভ করতে পারেনি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের সামগ্রিক পাঠদান, বইপুস্তক ও পরীক্ষাপদ্ধতিতে মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে। সে-কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সহজ উপায়ে পাস করার চেষ্টা করে থাকে। এমন একটি নাজুক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা আগামী বছর বাধ্য হবে একমুখীশিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করতে। যারা বীজগণিত-জ্যামিতির ভয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে পরলে বাঁচে তাদের আগামী বছর তা পড়তে হবে। রসায়ন-পদার্থ ও জীব-উদ্ভিদবিদ্যার নাম শুনলে যাদের হাঁটুসুদ্ধ কাঁপে তাদের আগামী বছর তা গিলতে হবে। জানি না, কীভাবে তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হবে। সবই মেনে নিলাম। কিন্তু কী করল সরকার নতুন একমুখী শিক্ষাক্রমের অধীনে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণে?

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশের এই যুগে এনসিটিবি এবং বেসরকারি উদ্যোগে একই বিষয়ে একাধিক বই রচনার সুযোগ করে দেওয়া হল—তাও মেনে নিলাম। একই বিষয়ে একাধিক বই বাজারে পাওয়া যাবে, ছাত্রছাত্রীরা ঐসব বই পড়ে ভালো ফলাফল করবে, অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে ইত্যাদি আদর্শবাদী কথা শোনা গেল। ২০০৪ সালে সরকার বেসরকারি উদ্যোগে নবম-দশম শ্রেণীতে একই বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ের সুযোগ করে দিল। ২০০৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা একই বিষয়ে একাধিক ভালো বই পাওয়ার কথা। কিন্তু ২০০৫ সালের অভিজ্ঞতা কী বলে? এনসিটিবির নির্ধারিত বই থাকা অবস্থায় বেসরকারি উদ্যাগে লিখিত এবং এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বই যত গুণে বা মানেই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা স্কুলগুলো খুব একটা গ্রহণ করেনি। করেনি কারণ, কোন্ বইটি ভালো, কোন্‌টি খারাপ সেই বিচার বিশ্লেষণ করা, স্কুলপর্যায়ে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ড প্রশ্ন-প্রণয়নে কোন্ বইটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তাও নিশ্চিত নয় ছাত্র-শিক্ষকগণ। তাছাড়া হাজার হাজার স্কুলে প্রকাশনা-সংস্থাগুলোর পক্ষে বই নিয়ে পৌঁছানো দুঃসাধ্য, ব্যয়বহুল ব্যাপার। সৌজন্য কপি বিতরণ করা, থানাপর্যায়ের শিক্ষকসমিতিকে ধরাধরি করা ইত্যাদি বিষয়গুলোও সম্মুখে চলে এসেছে। ১ বছর যেতে-না-যেতে আবার আগামী বছর নতুন করে একমুখী শিক্ষাক্রমের অধীনে বেসরকারি উদ্যোগে বই রচনা করা কতখানি যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা বলা বাহুল্য।

www.pathagar.com

এবার সামাজিক বিজ্ঞানের অধীন ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতির জন্য যে দুখণ্ডের বই রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা শেষপর্যন্ত কী রূপ লাভ করতে যাচ্ছে বই হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের এসব বই রচনার জন্য কর্তৃপক্ষের ধারণাগত প্রস্তুতি তেমন ছিল বলে মনে হয়নি। অনেকটা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এবার বইগুলো হতে যাচ্ছে। এসব বই রচনার জন্য যে-সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। রাতারাতি পাঠ্যপুস্তক লেখার নজির পৃথিবীতে না-থাকলেও বাংলাদেশে লিখতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। গেল বছর প্রায় দুইশো পৃষ্ঠার একটি ইতিহাস-বই রচনার জন্য ইতিহাস-বইয়ের লেখকরা সময় পেয়েছিলেন মাত্র দেড়-দুই মাস। এ বছরও নতুন পদ্ধতির বই লেখার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল মাত্র তিন মাস। এত কম সময়ে পাঠ্যবই রচনা করার কৃতিত্ব দেখানো যায়, কিন্তু মানসম্পন্ন বই পাওয়া মোটের ওপর অসম্ভব ব্যাপার। অধিকন্তু এ-বছর যেসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছে তাতে এনসিটিবি-কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার মধ্যে ধারণাগত অস্পষ্টতা ব্যাপক ছিল, পাঠ্যসূচিতে সুনির্দিষ্ট কোনো শিরোনাম ছিল না। ফলে বইয়ের মধ্যে পাঠের সংখ্যা ঠিক থাকলেও শিরোনাম এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে ভিন্নতা থাকবে বলে আমার আশঙ্কা। অধিকন্তু এবার বইতে প্রশ্নের ধরন-ধারণেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের দলভিত্তিক আলোচনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের বিভিন্নতা ও বিষয়বৈচিত্র্যকে ধারণ এবং বহন করার ক্ষমতা আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্কুলের শিক্ষকগণই রাখেন কিনা সন্দেহ আছে। নতুন পদ্ধতিতে পাঠদান, শিখনফল আদায় করা এবং পরীক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কী হবে আগাম বলা মুশকিল। তবে শিক্ষকগণ যদি এই বইগুলোর বিষয়বস্তু, পাঠদানের পদ্ধতি, শিক্ষাফল লাভে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের করণীয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ না করেন তাহলে নতুন পদ্ধতি নিয়ে স্কুলগুলোতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা মানসিক বাড়তি চাপে পড়তে পারেন বলে আমার ধারণা। এর থেকে উত্তরণের পথ এখনই তৈরি করা না-গেলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় আরো বড়ধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তখন একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গোটা মুখটাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাতে সংকট শুধু বৃদ্ধিই নয়, নানামুখী এবং জটিলই হয়ে পড়বে। তেমন একটি সংকটের পদধ্বনিই আমি শুনতে পাচ্ছি। সরকার সেই পদধ্বনি কীভাবে রোধ করবে তা এখনই উদ্ভাবন ও নির্ধারণ করবে সেটিই সকলের প্রত্যাশা।

২৮ আগস্ট ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

একমুখী শিক্ষা স্থগিত, বহুমুখী সমস্যা উদ্ভূত

পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবের কথা বলে, শেষপর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বহুল-সমালোচিত 'একমুখী শিক্ষা' স্থগিত করেছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক অবশ্য বলেছেন যে, ১ বছর পর এটি বাস্তবায়ন করা হবে। জানি না সেই সুযোগ ড. ওসমান ফারুক এবং এহসানুল হক মিলন পাবেন কিনা। তবে এটি যে বিশ্বব্যাপী অধীত একমুখী শিক্ষার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা গত কয়েক মাসের আলোচনা, সমালোচনা, লেখালেখি ও সেমিনারের মতামত থেকে দেশবাসী কিছুটা হলেও জানতে বা বুঝতে পেরেছেন। এরপরও আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ২০০৭ সালে এটি কেন বাস্তবায়ন করতে যাবেন জানি না। মনে হচ্ছে তেমন উদ্যোগের ফলাফল এ-বছরের চাইতে ভালো কিছু হবে না।

এ বছর একমুখী শিক্ষার নামে শিক্ষামন্ত্রণালয় যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে ৫০০ কোটি টাকার অপচয় নিয়ে কথা উঠেছে। শিক্ষকসংগঠনগুলো অবশ্য বলেছেন যে, এই অপচয়ের পরিমাণ আরো অন্তত দশগুণ বেশি হবে। আমরা এই পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচ বুঝতে পারব না। অন্যদিকে প্রকাশক সমিতিগুলো দাবি করেছে যে, একমুখী শিক্ষার ফাঁদে পা দিয়ে তাদের ১ হাজার কোটি টাকা গচ্চা গেছে। তারা এখন সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করছে, ক্ষতিপূরণ না-পেলে তারা আদালতে মামলা ঠুকবে বলে হুমকি দিয়েছে। অবশ্য বেচারা লেখকদের পক্ষে বলার কেউ নেই। তারাও প্রকাশকদের আবদার রেখে দিনরাত পরিশ্রম করে পাণ্ডুলিপি লিখে দিয়েছেন, প্রুফ দেখেছেন, ইতিমধ্যে অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির অনুমোদন এবং সম্পাদনার কাজও সমাপ্ত হয়েছে। কাজটি এনসিটিবির মাধ্যমেই হয়েছে। লেখক-সম্পাদকদের শ্রমের মূল্য দেবে কে? এর চাইতেও বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে একমাস পর ছাত্রছাত্রীদের হাতে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো যাবে কিনা। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক অবশ্য বলেছেন, পৌঁছানো সম্ভব হবে। তবে কীভাবে সম্ভব হবে তা তিনি খুলে বলেননি। অপরদিকে প্রকাশকরা জানিয়েছেন এর জন্য সময় লাগবে দুই থেকে আড়াই মাস।

সবকিছু মিলিয়ে সামনে বেশকিছু সমস্যা আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হানা দিতে যাচ্ছে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ নিয়ে যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন, তাই তার কথা কতখানি ঠিক

www.pathagar.com

থাকে সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে চাই। এ সমস্যাটির সমাধান হবে সেটি আমি আশা করব। তবে আমার জানা মতে, গেল শিক্ষাবছরে এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি উদ্যোগে রচিত ৭টি বিষয়ের একাধিক করে বই প্রকাশকদের কাছে জমা আছে। এনসিটিবি বইসমূহের তালিকা স্কুলসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করলে ছাত্রছাত্রীরা বাজার থেকে বইগুলো কিনে নিতে পারে। বাকি বইগুলো এনসিটিবি দ্রুত প্রকাশের উদ্যোগ নিলে সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তবে আমি একমুখী শিক্ষা বা ২০০৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীতে প্রবর্তিত এনসিটিবি অনুমোদিত বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কিছু দ্বিমতের প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেননা বিষয়টি সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ মানুষই বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হয় না।

২০০৪ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয় নবম-দশম শ্রেণীতে এনসিটিবির পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ে একাধিক বই দেওয়ার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে এসব বই বেসরকারি পুস্তক-প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করবে। তবে বইয়ের প্রতিটি পাণ্ডুলিপি এনসিটিবিতে ৩০ হাজার টাকাসহ জমাদান, জমাকৃত পাণ্ডুলিপি স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত ও সুপারিশকৃত হলেই কেবল প্রকাশের জন্য অনুমোদন লাভ করার নিয়ম করা হয়। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে শুরু হওয়া নবম-দশম শ্রেণীর ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ৭টি বিষয়ে এ-ধরনের একাধিক (কোনো কোনো বিষয়ে ৩০-৩২টি) বই অনুমোদন দেওয়া হয়। সেই বই বাজারে যেতে-না-যেতেই 'একমুখী শিক্ষা'র সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় মাঠে নামে। একে তো একমুখী তার ওপর এনসিটিবির পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিটি বিষয়ে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী একাধিক বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল। প্রকাশনাজগতের হুমড়ি খেয়ে পড়ার দৃশ্য! এক এক প্রকাশনা সংস্থা বাংলা-ইংরেজি ছাড়া অন্য সব বিষয়েই একাধিক পাণ্ডুলিপি জমা দিল। এসব উদ্যোগ গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস থেকেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়। যদিও একমুখী শিক্ষার ঘোষণাটি সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছিল ১২ জুন তারিখ।

এনসিটিবিকে কেন্দ্র করে বাংলাবাজারের প্রকাশনাজগতের গড়ে-ওঠা সম্পর্ক নিয়ে আমরা ভাসাভাসা শুনি, জানি। তবে আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয়,এনসিটিবির আমলা এবং বাংলাবাজারের প্রকাশনার জগতের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়টি এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যা নিয়ে শিক্ষার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলা বেশ কঠিন ও জটিল। বেসরকারি উদ্যোগে একই বিষয়ে একাধিক বইয়ের অনুমোদন নিয়ে বাংলাবাজারের প্রকাশনার জগৎ যেমনটি আশা করেছিল, বাস্তবে গত বছরে তারা মনে হচ্ছে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে, এ বছর অনেকে বোধহয়

www.pathagar.com

পথে বসার মতো পর্যায়ে পড়েছে। এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতি তৈরিতে মনে হচ্ছে তাদের কারো কারো ভূমিকা বা কৃতিত্বই বেশি। তারা মনে করেছিলেন যে, পাঠ্যপুস্তকের বিশাল বাজার তারা দখল করে ফেলতে পারবেন। সে-কারণে কোনো কোনো প্রকাশনা সংস্থা একমুখী শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবই লেখানোর পাশাপাশি নোটবই ছাপানোর (অগ্রিম) কাজও সম্পন্ন করে বসেছিলেন। তবে সব প্রকাশনা সংস্থা তেমন তোড়জোড়ে নেমেছিলেন তা বলা যাবে না। কিন্তু বেশকিছু প্রকাশনা সংস্থা প্রতিযোগিতার বাজারে ১ হাজার মাইল গতিতে দৌড়াতে চেয়েছিলেন, তারা মারা পড়লে করার কিছু নেই। কিন্তু যেসব প্রকাশনা সংস্থা এনসিটিবির স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক এর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে শেষপর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তারা এনসিটিবিকেই প্রতিটি পাণ্ডুলিপির জন্য ৩০ হাজার টাকা করে জমা দিয়েছে, কেউ কেউ কোনো কোনো লেখককে অগ্রিম সম্মানী প্রদান করেছে (অবশ্য অধিকাংশ প্রকাশকই সম্মানী পরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন)—তারা তো বেশ অঙ্কের অর্থ খরচ করেছে।

এনসিটিবির একটি নীতিগত প্রতিযোগিতায় যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল, তারা সরকারের নিয়মমতো অর্থ জমা দিয়েছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতেও তাদের বেশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। যেসব পাণ্ডুলিপি অনুমোদন পেয়েছিল, এখন যেহেতু সরকার প্রোগামটি স্থগিত করেছে, তাই এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিটি পাণ্ডুলিপির জন্য জমাকৃত ৩০ হাজার টাকা এবং সঙ্গে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রকাশকদের ফেরত দেবে এটি আমরা আশা করব; একই সঙ্গে লেখকদের সঙ্গে এনসিটিবির নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক রচনায় যেভাবে লেনদেনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এক্ষেত্রেও সেই নিয়ম অনুযায়ী লেখকদের ক্ষতিপূরণ দেবে—তাই আশা করব। তাতে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের কত টাকা ব্যয় হবে তা তারাই হিসাব করে বলতে পারে। প্রকাশকরা এর বাইরে অন্য কোনো খাতে অর্থ খরচ করলে তার দায়দায়িত্ব তাদের। তাদের দাবিকৃত ১ হাজার কোটি টাকার হিসাবটি তারাই ভালো জানেন। তবে আমি মনে করি যে, এনসিটিবি ৫০০ কোটি টাকা এমনিতেই অপচয় করেছে; শিক্ষক-নেতৃবৃন্দের হিসাব মতে তা ৫ হাজার কোটি টাকা; জানি না কোন্‌টি ঠিক। তবে এক্ষেত্রে যে কয় কোটি টাকা খরচ হবে তার জন্য কেউ এনসিটিবিকে অপচয়ের অভিযোগ দেবে বলে মনে হয় না। এখন শিক্ষামন্ত্রণালয় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেবে—সেটিই সকলের প্রত্যাশা।

এবার একটি মৌলিক নীতিগত সমস্যার প্রতি সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়, দেশের শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাধ্যমিক স্তরে একই বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের আবশ্যকতা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাথায় কে ঢুকিয়েছে। বিশ্বের উন্নত বেশিরভাগ দেশেও এখনো পর্যন্ত স্কুলপর্যায়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন নেই। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে এই চিন্তাটি

www.pathagar.com

খুবই মারাত্মক হয়েছে। কেননা, আমাদের বেশির ভাগ অভিভাবকদের পক্ষে একই বিষয়ে একাধিক পাঠ্যবই কেনা প্রায় অসম্ভব। স্কুলপর্যায়ে এমনিতেই লেখাপড়া, পাঠদান, পরিবেশ, শিক্ষকের মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য বিরাজ করছে। তার ওপর পাঠ্যবই নিয়েও যখন বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে তখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের ব্যবধানও বেড়ে যাবে। আমি মনে করি নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি বিষয়ে মানসম্মত একটি বইই যথেষ্ট। তবে আমাদের বেশিরভাগ স্কুলপাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। ছাত্রছাত্রীদের ধারণক্ষমতাকে বিবেচনা করে এসব বই সবসময় রচিত হয়নি। কোনো কোনো বইতে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনায় মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। বইগুলো যে-প্রক্রিয়ায় স্বল্পসময়ের মধ্যে লেখানো হয়ে থাকে তা পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আমাদের এখানে বই লেখানো হয়ে থাকে ৩/৪ মাস সময় দিয়ে, বইয়ের বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন এবং সম্পাদনা মোটেও মানসম্পন্নভাবে হয় না। তাছাড়া সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আমলারা পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের বিষয়বস্তু রচনায় শিক্ষামন্ত্রণালয় দেশে স্বীকৃত দলিলের তথ্যকে অস্বীকার করে তাদের দলীয় রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পাঠ্যপুস্তকে চাপিয়ে দিয়ে থাকে—যা কোনো দেশের পাঠ্যপুস্তকে মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধের 'ঘোষক'-এর পদে জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বয়ং জিয়াউর রহমানের দেওয়া ভাষণে উল্লিখিত তথ্যকে কেটে দিয়ে নিজেদের বানোয়াট কথাবার্তা (বানোয়াট কথা কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নয়) লিখে দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ে অন্তত ১৮টি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে যেগুলোতে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ইতিহাসবিকৃতি ঘটানো হয়েছে। সুতরাং এসব পাঠ্যপুস্তককে আমি অন্তত পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা দিতে রাজি নই। বেসরকারি উদ্যোগে লিখিত গতবছর এবং এ-বছরের বইতেও সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আমলারা অযাচিতভাবে হাত দিয়েছেন। লেখকদের অনুমতির তোয়াক্কা করেননি। (আহারে পণ্ডিত! জ্ঞানের জগতে ঐসব পণ্ডিতের মূল্য কত হতে পারে আপনারা কেউ বলবেন কি?)

আমি চাই বাংলাদেশে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আমলারা স্কুলপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনাতে কীভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ ও হস্তলিখন রেখে আসেন সেকথা দেশের সকল মানুষ জানুক, পড়ুক এবং খোঁজ নিক। তাই বলেছিলাম, আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোর মান শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কারণেই নষ্ট হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ-ধরনের রাহুর হাত থেকে এগুলোকে কবে কীভাবে মুক্ত করা যাবে—জানি না। তবে আমি মনে করি স্কুলপাঠ্যপুস্তকগুলো আরো আকর্ষণীয়ভাবে, প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক ও ভাষাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাহলে একটি করে বইই স্কুলপর্যায়ের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের ধারণাটি ছাত্র-শিক্ষকরা নানা কারণেই ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। বিশেষত, বোর্ড-কর্তৃক অনুমোদিত সব বইই যথাযথ মানসম্মত হয়নি। কিন্তু প্রকাশকরা শিক্ষক সমিতি, স্কুলশিক্ষকদের কতখানি প্রভাবিত করতে পারছেন তার ওপর নির্দিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বইটি গ্রহণ করেন বা করেন না। গত বছরের অভিজ্ঞতা মনে হচ্ছে খুব একটা সুখকর নয়। কেননা স্কুলপর্যায়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বোর্ডের বইকে যতখানি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, বেসরকারি উদ্যোগে লিখিত বই (যত ভালোই হয়ে থাকুক না কেন) ততখানি গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এ-ধরনের অপ্রয়োজনীয় এক্সপেরিমেন্টে স্কুলপর্যায়ে পাঠ্যবই নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল বলে মনে হয় না। আমরা একটি মানসম্মত বইই যেখানে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পারছি না সেখানে একই বিষয়ে একাধিক বইয়ের চিন্তা যেসব আমলা এবং পুস্তক প্রকাশক করেছেন, তাদের ব্যক্তিগত কোনো লাভালাভ এক্ষেত্রে থাকতে পারে, কিন্তু এর মাধ্যমে দেশের স্কুলপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সমৃদ্ধ জ্ঞানার্জনে গড়ে-তোলার চিন্তা অবাস্তব, কল্পনাবিলাসী এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীও বটে। এর নমুনা আমরা দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনই দেখতে পাচ্ছি। এর অবসান করতে হলে আমলানির্ভর বুদ্ধি নয়, সত্যিকার শিক্ষা বিজ্ঞানের ধারণায় সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, অন্য কোনো উপায়ে আশা করার কিছু নেই।

১৬ ডিসেম্বর ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

এক বিজয়ী জাতির মুক্তিযুদ্ধের ছিন্নভিন্ন ইতিহাস

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের এই দিনে সকলে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, ক'দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী যুদ্ধরত মানুষ পৃথিবীর বুকে একটি বিজয়ী জাতির পতাকা হাতে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেশের জন্য একদিকে মানুষ উজাড় করে দিচ্ছিল নিজেদের মূল্যবান প্রাণ; অন্যদিকে মুক্ত-অঞ্চলে বিজয়কেতন উড়িয়ে মানুষ আনন্দ প্রকাশ করছিল, প্রিয়জনদের খুঁজে পেতে ছোটাছুটি করছিল, প্রতীক্ষা করছিল যুদ্ধশেষে সবার খোকারা কবে ঘরে ফিরে আসবে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর প্রচারিত হলে গোটাদেশ একযোগে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে নেচে উঠেছিল, মুহূর্তের জন্য হলেও মানুষ ভুলে গিয়েছিল নয় মাসের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা, অতি প্রিয়জনদের হারানোর শোকের বেদনাও। অনেক মূল্যে কেনা স্বাধীনতা ও বিজয়ের আনন্দ কেমন হতে পারে তা গোটা দেশ, সারা পৃথিবী ১৯৭১ সালের এইদিনে প্রত্যক্ষ করেছিল এখানে। একটি বিজয়ী জাতি এত শোক, এত কিছু হারানোর যন্ত্রণাকে কীভাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে তা সবাই তখন প্রত্যক্ষ করেছিল। একটি বিজয়ী জাতির আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটি গোটা জাতির জীবনকে এভাবেই আলোড়িত করে, উদ্বেলিত করে; তাই এটি হয় জাতির সবচেয়ে স্মরণীয়, বরণীয়, অহংকার এবং গর্বের বিষয়। জাতির ইতিহাসে এটি তাই বিবেচিত হয়ে থাকে মহৎ অর্জন হিসেবে। এর ক্ষতি, নষ্ট, ধ্বংস, অপবিত্রতা ও অমর্যাদার কোনো অবকাশ সেই জাতির জীবনে আদৌ আছে কি?

এটা ২০০৩ সাল। এখন ডিসেম্বর মাসই চলছে। দেশের কোথায় সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস? কোথায় মুক্তিযুদ্ধের সেই শৌর্য-বীর্য এবং বীরত্বের চর্চা? কোথায় মুক্তিযুদ্ধের সেই অনুভূতি, আবেগ, চেতনা ও বাস্তবতার কথা? কোথায় সেই জাতীয় ঐক্য? বরং দেখা যাচ্ছে ১৯৭১ সালের এই দিনে যারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে হত্যায় লিপ্ত ছিল তারা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে ঢাকার রাস্তায় বীরদর্পে চলাফেরা করছে,কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধার পাশে বসে তারা ১৯৭১-এর রাজনৈতিক নেতাদের এবং বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে তুচ্ছ করে কথা বলছে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের 'নতুন' কথা শোনাচ্ছে, রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে জাতিকে বিভক্ত না-করার উপদেশ দিচ্ছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন অনেক মানুষ এখন

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, নেতৃত্ব নিয়ে সবচেয়ে আপত্তিকর কথা বলছেন, মিথ্যাচার করছেন, মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপন করছেন। এই ডিসেম্বরে তাদের বলা ও লেখা মুক্তিযুদ্ধের এক ছিন্নভিন্ন ইতিহাস দেখে নতুন প্রজন্মের সৎ ও মেধাবী তরুণরা লজ্জিত হচ্ছে, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে আমাদের গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জনের দিক থেকে। তারা যুক্ত হতে পারছে না মহান একাত্তরের বিজয়ী জাতির মহাআনন্দের উৎসবে, ইতিহাসের মূল স্রোতোধারায়।

পৃথিবীতে এখন স্বাধীন-সার্বভৌম, রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯২টির মতো। এর বেশিরভাগই কোনো-না-কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে সংগ্রাম, যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের মতো কিছু করে স্বাধীনতা লাভ করেছে। গত দুই-আড়াইশত বছরের মধ্যেই এমন অভূতপূর্ব সব যুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের উত্থান এবং অভ্যুদয় ঘটেছে। পৃথিবীর সব দেশ, সব জাতিই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা,বিপ্লব বা সেই মাপের কোনো বড় ধরনের বিজয়ের দিবস পালন করছে, এর ইতিহাসকে সবচেয়ে ঊর্ধ্বে স্থান দিচ্ছে; দিবসটির পালনও ঐসব দেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দ-উৎসবের মধ্যদিয়ে ঘটে থাকে। শুধু আনন্দ-উৎসব পালনই নয়, জাতীয় জীবনের এই দিনটিকে প্রায় সব দেশ ও সব জাতিই নতুনভাবে বোঝা ও শেখার মধ্যদিয়ে একটি উপলব্ধি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। আসলে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে একীভূত করার চেষ্টা শেকড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার এসবই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে। পৃথিবী এখন যতই ইউনিপোলারের দিকে ধাবিত হোক না কেন, বহুত্বের মধ্যেও যার যার ইতিহাস, জাতিসত্তার পরিচয় এবং অর্জন তার তার-এই নীতি থেকে কেউই বিচ্যুতি হয়নি এখনো। সেই ধারা থেকে আমেরিকানরা যেমন নিজেদেরকে বিযুক্ত করছে না, ইউরোপের কোনো ক্ষুদ্র জাতিসত্তাও করছে না। জাতি এবং রাষ্ট্রীয় বৈচিত্র্যের এমন একটি বাস্তবতার মধ্যে পৃথিবী এখন অবস্থান করছে।

অথচ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই বাংলাদেশে। এখানে যে-মানুষটি ১৯৭১ সালে যা দেখেছেন বা অর্জন করেছেন, সেই মানুষটিই এখন স্বার্থের কারণে তা দিব্যি অস্বীকার করছেন, ভিন্নসুরে কথা বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ও টানাটানিতে নেমেছেন এমন সব মানুষ, এমন সব রাজনীতিবিদ—যাদের ব্যক্তি জীবনে না আছে মহৎ কোনো আদর্শ, না আছে পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো ধারণা। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ১৯৭২-৭৫ সালে যাকে মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা বলে লিখেছেন; মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস, নেতৃত্ব ও জনগণের ভূমিকা নিয়ে যেভাবে বই, প্রবন্ধ বা সাধারণ লেখালেখি করেছেন; এখন তাদেরই কেউ কেউ সেইসব সত্যকে চরমভাবে অস্বীকার করেছেন, স্বাধীনতার ঘোষকের একটি পদ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে অবিরত লিখে চলেছেন; অথচ ১৯৭১ সালের The Proclamation of Independence নামক আমাদের একটি মূল্যবান দলিল রয়েছে, সংবিধানে এর স্বীকৃতি রয়েছে। এত সবকিছুকে এসব ব্যক্তিই এখন অস্বীকার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বের নাম-ধাম, তারিখ, প্রেক্ষাপট, কার্যকারণ থেকে শুরু করে সবকিছুকেই কলমের জোরে অস্বীকার করছেন কেউ কেউ। বেতার-টিভি ও আলোচনাসভায় এইসব বক্তা ও আলোচক জাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মনগড়া কথা বলে বেড়াচ্ছেন, ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন, পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা-খুশি তা লিখে চলছেন; স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্রেও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মনগড়া তথ্য উপস্থাপন করে লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অঙ্গীকার, শহীদদের প্রতি যাদের ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়কে এখনকার এই সময়ে এমন মনগড়া তথ্য ও ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করতে পারেন না।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রশি-টানাটানির এমন ন্যক্কারজনক কাণ্ডকীর্তি দেখে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। অথচ ঐ মানুষগুলো নির্লজ্জের মতো মিথ্যাচার করেই যাচ্ছেন। তাদের কাণ্ডকীর্তি দেখে ১৯৭১ সালে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, স্বাধীনতা-পরবর্তী এই সময়ে দেশে-বিদেশে লেখাপড়া করেছি, কিছু শিখেছি বলে বিশ্বাস করি—তাদের চোখ ও কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থে যারা নিজের জাতির ইতিহাসকে নিয়ে এমন তামাশায় লিপ্ত হচ্ছেন তারা গর্হিত অপরাধ করছেন। ১৯৭১ সালে একজন মানুষ কোনো দল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন, তবে তিনি তখন যে বাস্তবতার মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতার বিষয়টি বর্তমানে তার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, দল পরিবর্তন করার সঙ্গে একাকার করার প্রয়োজন পড়ছে কেন বোঝা মুশকিল। বর্তমানে বিএনপিসহ কয়েকটি দল ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে শুধু ছোটই করছে না, অস্বীকারও করছে; বিভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থহীন, যুক্তিহীন বিতর্কও জড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে; মুক্তিযুদ্ধের একক কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ব্যক্তি-মানসিকতা এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ও উদ্যোগ দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। সে-কারণেই দেশের স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে চলছে জোরজবরদস্তিমূলক চেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের এই ডিসেম্বর মাসে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেমন চেতনা নিয়ে অবস্থান করছে তা দেখা যেতে পারে।

দেশের স্কুলপর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একটি সামরিক যুদ্ধ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ

www.pathagar.com

ঘোষণা, এর নিয়ামক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিক নেতৃত্বই এককভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অপরদিকে যে রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব এতবড় একটি মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করেছিল, বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছিল সে-সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার কৃতিত্ব ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানকে এককভাবে দেওয়া হয়েছে স্কুলপাঠ্যপুস্তকসমূহে। লেখা হয়েছে : '২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের শাসকরা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। দিকনির্দেশনার অভাবে দেশবাসী হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন এগিয়ে এলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি ২৬ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' এই বক্তব্যটি স্কুলের প্রায় ১৮টি বইতে ঘুরেফিরে এখন লেখা আছে। এখানে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ব্যর্থ এবং 'ত্রাতা' হিসেবে সামরিক বাহিনীকে দেখানো হয়েছে। এর ঘোষণার তারিখটিও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের বাস্তবতাটি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়নি।

জিয়াউর রহমানকে এভাবে একক ও ত্রাতা হিসেবে উপস্থাপনটি মূলত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ বাঙালি অসংখ্য সামরিক অফিসার ও সদস্যের মতো জিয়াউর রহমানও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আস্থা রেখে। একটি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ঝুঁকি কেউ এমনি এমনি নেয় না। নেতৃত্ব, জনগণের সমর্থন, বাস্তবতা ইত্যাদিকে বিবেচনা করেই বাঙালি সামরিক সদস্য, পুলিশবাহিনী, আমলাগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। জনগণ, ছাত্র, তরুণসহ সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী যতখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন ও সংগ্রামে যোগদান করে অপর গোষ্ঠীগুলো সেভাবে করে না। কিন্তু যখন দেশে স্বাধীনতার মতো একটি বাস্তবতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যখন এর সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়, তখনই কেবল সামরিক বাহিনী,পুলিশ ও আমলাদের মতো গোষ্ঠী তাতে যুক্ত হতে পারে। এই বাস্তবতা তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা, দৃঢ়তা, অবস্থান, কর্মসূচি, কৌশল ইত্যাদির কোনো বিকল্প থাকতে পারে না। সুতরাং ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক শক্তির ব্যর্থতার মুখে এককভাবে দাঁড়িয়ে একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, আর দেশের জনগণ বাড়ি ছেড়ে ভারত গিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছেন—এমন বাস্তবতা ১৯৭১ সালে কেউ দেখেনি, শুনেওনি। যারা এভাবে বর্তমানে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেজন্য পাঠ্যপুস্তকে সবকিছু পরিবর্তন করে লিখিয়েছেন তারা আসলে জিয়াউর রহমানকে ১৯৭১ সালেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চান। ইতিহাসে কি কাউকে এভাবে কারো বিরুদ্ধে জোর করে দাঁড় করানো সম্ভব? বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ এবং তৎকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যারা আস্থা স্থাপন করেছিলেন তারাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারা করেননি

www.pathagar.com

তারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী গড়ে তুলেছিল, পাকিস্তান বাহিনীর দোসর সেজেছিল, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। সুতরাং জিয়াউর রহমানকে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিপক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা মহৎ কোনো চিন্তা থেকে করা হয় না, বরং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদানকে খাটো করতে গিয়ে জিয়াউর রহমানকে প্রতিপক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়, যা তখন আদৌ জিয়াউর রহমান ছিলেন না, তিনি তখন মূলধারার একজন যোদ্ধা হিসেবে তার অবদান রেখেছিলেন।

পাঠ্যপুস্তকে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের জীবনী সংকলিত হয়েছে—যারা সকলেই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য বেসামরিক, রাজনৈতিক নেতাকর্মীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, দেশের জন্য তারা জীবনও দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর কয়েকজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার জীবনী অন্তর্ভুক্ত হলেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে যারা শহীদ হলেন তাদের মধ্য থেকে তেমন কারো জীবনী পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়নি। পাঠ্যপুস্তকে বুদ্ধিজীবী-হত্যার সঙ্গে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর জড়িত থাকার কোনো কথা নেই। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আওয়ামীলীগ,ন্যাপ, সিপিবির মতো রাজনৈতিক শক্তির উল্লেখ ছিল, তা এখন বাদ দেওয়া হয়েছে—যেহেতু জামাত এবং মুসলিম লীগসহ কতিপয় বিরোধীদলের কথা ২০০১ সালের আগের সংস্করণে উল্লেখ ছিল। এখন ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে গিয়ে 'বঙ্গবন্ধু' বলে কোনো রাজনৈতিক নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতে পারবে না, বরং তিনি একজন ব্যর্থ এবং স্বাধীনতার পর একদলীয় বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র-হত্যাকারী শাসক হিসেবে ব্যর্থ লোক ছিলেন; অপরদিকে মেজর জিয়াউর রহমান সবসময় দেশ ও জাতির বিপদের দিনে 'ত্রাতা' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যেমনিভাবে ১৯৭১ সালে, একইভাবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। পাঠ্যপুস্তকে এখন আর স্বাধীনতার বিরোধী বলে কেউ নেই, কারণ বর্তমান সংস্করণের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সামরিক যুদ্ধ!

কলেজসমূহে এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকগণ নির্ভয়ে ১৯৭১ সালের প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দেন না, কেননা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল কোনো অবস্থাতেই 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি শুনতে রাজি নয়; আওয়ামী লীগের কোনো ভূমিকা ছিল তা তাদের মনঃপূত নয়। কোনো শিক্ষক সেভাবে পড়ালে তিনি হবেন 'আওয়ামীপন্থি' শিক্ষক বলে। এখন পড়াতে হবে : আওয়ামী নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই ত্রাতা জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চে নয়, ২৬ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চে নেতারা যা বলছেন শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষককে তা বলতে হচ্ছে। নতুবা হুমকি-ধামকি, বদলি, চাকরি হারানো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১ সালকে ১৯৭১-এর

www.pathagar.com

বাস্তবতায় উপস্থাপন করা এই শাসনামলে তাই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বাস্তবতার কথা কেউ কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছেন?

বিশ্ববিদ্যালয়েও অবস্থা প্রায় অভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখন বলতে গেলে পঠিত বা আলোচিতই হয় না অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে। যদি কোথাও হয়ে থাকে, তাহলে জাতীয়তাবাদী ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী মার্কা এবং আওয়ামী মার্কা ইতিহাস উপস্থাপনের অভিযোগই শোনা যায়। এখন একদল পঙ্গপাল 'বুদ্ধিজীবী' তৈরি হয়েছেন যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ছিন্নভিন্ন করার কাজে মাঠে নেমেছেন, পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস লিখেছেন, শ্রেণীকক্ষে পড়াচ্ছেনও।

ক্ষমতার দম্ভ, সুযোগসুবিধা পাওয়া ও নেওয়ার উন্মত্ততায় দেশের যা-কিছু অর্জন তাকে বিসর্জন দিচ্ছে; তছনছ করছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা, দলীয় শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক। কিন্তু ইতিহাস এভাবে লেখা হয় না, শেখা যায় না। এখন যে বিকৃত ছিন্নভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে তার প্রতি আকর্ষণ নেই কোনো মেধাবী ও সৎ ছাত্রছাত্রীর। কেননা, তারা জানে ওই বইগুলোতে যা লেখা হয়েছে তা ১৯৭১ সালের বাস্তবতাকে ধারণ করে রচিত হয়নি; বর্তমানের দলাদলি, হানাহানি, সুবিধাবাদী, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিভক্তির রাজনীতিকে বিবেচনায় রেখেই ১৯৭১-কে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। আজ সে-কারণেই রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ দেশের সর্বত্র নেই কোনো মহৎ আদর্শের চর্চা। মহান মুক্তিযুদ্ধের এতবড় অর্জনকে যে জাতি এত স্থূলভাবে বিসর্জন দিতে পারে তার সম্মুখে আর-কোনো মহৎ আদর্শ অবশিষ্ট থাকে কি? ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে এমনই একটি আদর্শহীন বাস্তবতার মধ্যে আমাদের বসবাস। যদি আমরা এর থেকে উত্তরণ মনেপ্রাণে চাই, তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক চেতনায়; তবেই আমরা আবার সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে পারব সকল অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে। সেই শিক্ষা নিতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পঠন-পাঠন ও আলোচনা একান্তভাবে জরুরি।

ডিসেম্বর ২০০৩, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

আন্দোলন-সংগ্রামে নানা শিক্ষকসংগঠন

গত কয়েক মাস থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সরকারি-বেসরকারি, ইবতেদায়ি, কারিগরি, কমিউনিটি বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন ধারা, উপধারার বেশকিছু শিক্ষকসংগঠন ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং মুক্তাঙ্গন এলাকায় তাদের বেতনবৈষম্য দূরীকরণ, চাকরি জাতীয়করণ, বেতনবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের জন্য ধর্মঘট পালনসহ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এক সংগঠন সরকারের কাছ থেকে কিছুটা আশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তো, অন্য শিক্ষকসংগঠন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে; একইভাবে অবস্থান ধর্মঘট, অনশন কর্মসূচি নিয়ে অন্য শিক্ষকসংগঠন আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকসংগঠন তো একটানা ১০ দিন অনশন শেষে আত্মাহুতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিল। বিরোধীদল এবং পেশাজীবী সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধির অনুরোধে তারা চরম কর্মসূচি নেয়া থেকে বিরত থাকেন। এখনও আরো কয়েকটি শিক্ষকসংগঠনের নেতা-কর্মীরা মুক্তাঙ্গনে অবস্থান ও অনশন করছেন, আরো কিছু শিক্ষকসংগঠন তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে যাচ্ছে বলে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ঢাকায় এখন শিক্ষকদের নানা সংগঠনের বিভিন্ন দাবিদাওয়া, অবস্থান ধর্মঘট, অনশন ইত্যাদি দৃশ্যই দেখতে হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, আর কোনো পেশায় সমস্যা এতখানি হয়তো প্রকট নয় যতখানি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতায় বিরাজ করছে।

ইতিমধ্যে দেশের মানুষ কিছুটা হলেও জেনে ফেলেছে যে, এদেশে এমনও স্তরের শিক্ষক আছেন যাদের মাসিক বেতন মাত্র ৫০০ বা ৭৫০ টাকা! তবে অধিকাংশ মানুষ একটি বিষয় বুঝতে পারছে না—কেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম্মানিত শিক্ষকগণ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় এসে ঝড়-বৃষ্টি-রোদের তীব্রতা উপক্ষো করে রাস্তায় এভাবে অবস্থান-ধর্মঘট ও অনশনের মতো কর্মসূচি পালন করছেন, কেন সরকারের মেয়াদের শেষপ্রান্তে প্রায় সবক'টি শিক্ষকসংগঠন এভাবে দাবিদাওয়া নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন! অথচ সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বিকার, এক গ্রুপের সঙ্গে কথা বলছে তো অন্য গ্রুপকে অবজ্ঞা করছে। কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তো এসব প্রতিশ্রুতি আদৌ কোনোদিন বাস্তবায়িত হবে

www.pathagar.com

কিনা তা অতীত-অভিজ্ঞতায় সন্দেহ সৃষ্টি করছে। বিষয়টি যে বেশ উদ্বেগজনক, সবাইকে নিয়ে ভাববার মতো—তা মনে হচ্ছে কেউ তলিয়ে দেখতে চাচ্ছে না। কেননা, একদিন বা এ-বছরই শিক্ষকদের এভাবে আন্দোলন করতে দেখা গেছে তা কিন্তু নয়। বরং প্রতিবছর প্রতিটি সরকারের সময়ই শিক্ষক-সমিতিগুলোকে দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় নামতে দেখা গেছে। গেল সরকারের আমলে শিক্ষকরা ঢাকায় মিছিল করতে দেখলেই তৎকালীন বিরোধীদল অনেকটা যেন আগবাড়িয়ে তাদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে, যা এবার প্রধান বিরোধীদল তেমনটা খুব-একটা করেনি। গেলবার তৎকালীন বিরোধীদল শিক্ষকদের মধ্যে একটি বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়েছিল যে তারা ক্ষমতায় গেলে কোনো স্তরের শিক্ষককেই আর রাস্তায় আন্দোলন করতে হবে না, চাকরি জাতীয়করণসহ সবকিছু তাদের এমনিতেই হয়ে যাবে!

বিএনপি'র গত নির্বাচনী ইশতেহারের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৩.১০) বলা হয়েছিল : "...সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাইমারি বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য (সরকারি-বেসরকারি) দূর করা হবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অনুদানের পরিমাণ ১০০ শতাংশ করা হবে।" আমার মনে আছে বিএনপি'র ইশতেহারে প্রতিশ্রুতির এমন বহর দেখে আওয়ামী লীগ সমর্থক কয়েকজন শিক্ষক নেতা তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়াকে বিএনপি'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা দিয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে মৃদুভাষী কিবরিয়া সাহেব বলেছিলেন, "শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতারণা করার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। একটি সরকারের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত।" তারপরও শিক্ষকদের আওয়ামী লীগকে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যা তারা সরকারে গেলে বাস্তবায়ন করতে পারত কিনা আমার সন্দেহ আছে। তবে শিক্ষকরা ২০০১ সালে বিএনপির প্রতিশ্রুতির প্রতি বেশি আস্থাশীল ছিল; আ. লীগের প্রতিশ্রুতিকে যৎসামান্য বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

আসলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন বেহাল এবং হ-য-ব-র-ল অবস্থার জন্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধানত দায়ী। ৩৫ বছরেও তারা একটি শিক্ষানীতি গ্রহণ বা বাস্তবায়নের পথে না গিয়ে শিক্ষাকে নিয়ে আগাগোড়া রাজনীতি করেছে, শিক্ষকদেরকে 'পাইয়ে' দেওয়ার ও জাতীয়করণ করার লোভ দেখিয়েছে, বিনিময়ে ভোট পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। এছাড়া ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। দেশে একদিকে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানহীন, কেজি স্কুল; অন্যদিকে গ্রাম-গঞ্জে বেসরকারি প্রাথমিক,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ এবং মাদ্রাসা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সকল স্তরে শিক্ষক নিয়োগে মানের কোনো বালাই

www.pathagar.com

নেই, ঘুসের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ একটি বহুল প্রচলিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার যার ইচ্ছেমতো স্কুল ও মাদ্রাসা খুলে তারপর ঘুসের বিনিময়ে অনুমোদন পাওয়ার তদ্বির করছে।

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা; মেধা, মনন, সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং পরিচ্ছন্ন বোধ এর সঙ্গে অপরিহার্য—এই বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করে সর্বনিম্ন স্তর ও ধারা থেকে দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দলীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঘুসের বাধ্যবাধকতাকে নির্লজ্জভাবে কার্যকর করা হয়েছে; আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা ইত্যাদির মাধ্যমে গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে পেছনে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদি নিয়োগপ্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত হত, যদি সর্বত্রই মেধাবী এবং সৃজনশীল তরুণ-তরুণীরা শিক্ষকতার পেশায় আসার সুযোগ পেত তাহলে এত সম্পদের সীমাবদ্ধতা, অভাব-অভিযোগ এবং বিদ্যমান অবস্থাতেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চেহারাটা এতটা হতাশজনক, কলুষিত এবং খারাপ হত বলে আমি মনে করি না। এখন দেশে যেভাবে প্রতিযোগিতা দিয়ে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং দুর্নীতির বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল,মাদ্রাসা এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতে প্রতিবছর যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে বা হবে তার থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি খুব সামান্যই অর্জিত হওয়ার আশা করা যেতে পারে।

বস্তুত শিক্ষার মৌলিক ধারণাকে বাদ দিয়ে যত স্তরে যত ধারার, যত বেশিসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলা হোক না কেন; যত বেশিসংখ্যক শিক্ষকই নিয়োগ দেওয়া হোক না কেন; যত বেশি আর্থিক সুযোগসুবিধা শিক্ষকদের এবং প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত খাতে বাড়ানো হোক না কেন—তাতে জাতীয়ভাবে শেষ বিবেচনায় তেমন কোনো লাভের আশা করা যাবে না, বরং শিক্ষার নামে অর্ধশিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানবিরোধী শিক্ষা, অদক্ষ-অকর্মণ্য জনশক্তি সৃষ্টির বোঝাই জাতীয় জীবনে বাড়বে—যেমনটি ইতিমধ্যে বেড়েছে বলে আমার অভিজ্ঞতা বলছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং দেশের বাইরে দেখে আসা অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমি যখন তুলনা করে দেখি তখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, নামে একটি শিক্ষাব্যবস্থা হলেও প্রকৃত লেখাপড়ার কোনো আদর্শই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে এখন আর অবশিষ্ট নেই। ঐ যে বলেছিলাম একটি জাতীয় শিক্ষানীতির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে এদেশের আদর্শবিবর্জিত, সুবিধাবাদী, শিক্ষাদীক্ষাহীন রাজনীতিবিদ, আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাগোষ্ঠী, অর্ধশিক্ষিত ফড়িয়াগোষ্ঠী, অর্ধশিক্ষিত সার্টিফিকেটধারী বেকার জনগোষ্ঠী, প্রভাবশালী, ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীসহ সমাজের সকল অপশক্তি। দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এখন সম্মিলিতভাবে এদের হাতে দারুণভাবে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

একটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগিয়ে ভবন তৈরি করলে, কয়েকজন সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিকে শিক্ষক বলে নিয়োগ দিলে, কিছু নামধারী বই-পুস্তক ধরিয়ে দিলেই যদি শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে যায় বলে যারা মনে করেন তারা তা করতে পারেন—বাংলাদেশে আদতে সেভাবেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গড়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার বেশকিছু মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শেখা, চর্চা, ধারণ এবং প্রতিফলন ঘটানো ছাড়া মোটেও অর্জন করা সম্ভব নয়। নীতি-নির্ধারকরাই যদি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে থাকেন তাহলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাদের উদ্যোগ, কথাবার্তা ও প্রতিশ্রুতি থেকে যা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার কোনো মিল থাকবে না। বাংলাদেশে যে বিশাল শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে তা নীতি-নির্ধারকদের শিক্ষাচিন্তা থেকে হয়নি; হয়েছে সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, ব্যবসায়িক এবং আরো নানাসব ক্ষুদ্র বিবেচনা থেকে। এটি এখন আকার-আয়তন এবং ব্যয়বহুলতায় এতই দৈত্য-দানবের রূপ নিয়েছে যে, যারা ভোটের জন্য একসময় শিক্ষকদেরকে ঢাকার রাস্তায় দেখলে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শতভাগ বেতনভাতা, চাকরি জাতীয়করণসহ নানাধরনের সুযোগসুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; তারা পাঁচবছর ক্ষমতায় থেকে বারবার সম্পদের সীমাবদ্ধতার দোহাই দিচ্ছে, পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষকদের জন্য কিছু করা হবে, কিংবা আন্দোলনরত শিক্ষকদের সংগঠনের ব্যানারের সংখ্যা দেখে ভড়কে গেছে; এত টাকা কোথেকে আসবে বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, শিক্ষকদের সঙ্গে সামান্য সৌজন্যবোধ দেখানোরও প্রয়োজন মনে করছে না; অপরদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এখন যারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের এত সব স্তরের এত সব ধারা-উপধারার লক্ষ লক্ষ শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করবেন, বেতনবৈষম্য দূর করে ফেলবেন—তেমনটি আমি বিশ্বাস করি না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাপ্তি এখন এত বিশাল হয়েছে যে তা কিছু দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান পাওয়ার মধ্যে আর নেই। তাছাড়া সব শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। বিষয়টিকে আরো সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে দেখতে হবে, সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তাতে কিছু দৃঢ় এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবেই। সে-ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ঐক্যমত পোষণ করতে হবেই, এখানে দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতি বা ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো চিন্তা করা যাবে না। দেশের জন্য একটি অভিন্ন মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে—যেখানে কেবলমাত্র শিক্ষার আদর্শই বিবেচিত হবে; এতসব সরকারি-বেসরকারি, কমিউনিটি নামধারী নয়, বরং

www.pathagar.com

গ্রাম,গঞ্জ ও শহরে জনসংখ্যার চাহিদা অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজাতে হবে; যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে তাদের পাঠদানের স্থান নির্ধারণ করতে হবে; মেধাবী, সৎ, আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠদের শিক্ষকতার পেশায় আসার পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে; অযোগ্য, দলবাজ, অসৎ ব্যক্তিদের এই পেশা থেকে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে; দুর্নীতির স্বর্গ বলে খ্যাত শিক্ষাভবন, শিক্ষাবোর্ড অফিস ব্যবস্থাপনাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে; শিক্ষকদের মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সর্বোপরি দেশের শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। লেখাপড়াকে যারা এতদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা, কয়েকটি গাইড বই, কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রীদের যাওয়া-আসার আয়নায় দেখেছেন, তাদেরকে বলতে হবে : আপনারা আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে সুখে থাকুন, আমাদের জন্য এটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষক-আন্দোলন, দাবিদাওয়া ও প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট দেয়া হয়েছে। এ সবই সস্তা মানসিকতার বিষয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনায়। এখানে দলবাজি, দুর্নীতি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, রাজনীতি-প্রতিশ্রুতি এর কোনোটিরই কোনো স্থান নেই। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষকসংগঠন, সুশীলসমাজ, ছাত্রসমাজসহ সেই মানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; অন্য কোনোভাবে এর স্থায়ী কোনো সমাধান আশা করা যায় না। প্রয়োজন আসলে স্থায়ী সমাধানের—যার একমাত্র পথ একটিই—তা হচ্ছে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। সেটি আমাদের করতেই হবে, তাহলে শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে আর কোনো অসম্মানজনক অবস্থা তৈরি হবে না।

২ জুলাই ২০০৬, দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

এইচএসসির কৃত্রিম ফল বিস্ফোরণ মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাতে পারে

এ-বছর (২০০৬) এসএসসি পরীক্ষার ফল দেখার পর অনেকটা মহাজ্ঞানী (!) জ্যোতিষের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলাম যে, এ বছরের এইচএসসি, মাদ্রাসা-কারিগরি পরীক্ষার সাফল্য, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা এর চাইতেও বেশি হবে, রেকর্ড ভঙ্গ করবে।

আমার মেয়ে অন্বেষা এ-বছর রাজউক কলেজ থেকে ব্যবসায় গ্রুপের পরীক্ষার্থী ছিল। ফল প্রকাশের আগেরদিন তাকে কিছুটা টেনশন করতে দেখে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা, হিসাবনিকাশ না করেই বলেছিলাম : এ-বছর পাসের হার ঢাকা বোর্ডে ৭০ শতাংশের বেশিই হবে, জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও অঢেল হবে, সুতরাং জিপিএ-৫ নিয়ে তোমার চিন্তা করার কোনো কারণ দেখি না। অন্বেষা জানতে চেয়েছিল, কিসের ভিত্তিতে আমি এমনটি বলছি। ওদের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষকদের মূল্যায়নের তাড়া ইত্যাদি বিষয়গুলো আমার জানা ছিল। এসব কিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য সরকারের, আর তা হচ্ছে কৃতিত্ব নেওয়া। তাই ওকে বলেছিলাম এ বছর নির্বাচনের বছর, সবকিছুতে ভোটারদের খুশি করার চেষ্টা, যা এসএসসিতে করা হয়েছে তা এইচএসসিতে আরো বেশিই করা হবে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর কলেজে গিয়ে অন্বেষা তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করেছে, টিভি-পর্দায় ওদের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সেই ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, অন্বেষার মাকে দেখেছি একটি বেসরকারি টিভি-চ্যানেলে গর্বিত অভিভাবকদের একজন হয়ে সাক্ষাৎকার দিতে। এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন থেকে রাজধানীর মিষ্টির দোকানে বাঁধভাঙা ভিড় লেগেছে। বোঝাই যাচ্ছে মিষ্টি বিতরণের একটি উচ্ছ্বাসপর্বে আমরা অভিভাবকরা এখন আছি।

কিন্তু ফল প্রকাশের একদিন পরই দেখলাম আমার মেয়ে, তার বন্ধুবান্ধবীদের নতুন করে চিন্তায় আক্রান্ত হতে। দেশব্যাপী এইচএসসির এমন অবিস্মরণীয় ফলাফল দেখে তারাও কিছুটা শঙ্কিত—এত ছাত্রছাত্রীর ভর্তির জায়গা কোথায় হবে, পাসের চেয়ে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংকটটা ওদের কাছে তীব্রতর হচ্ছে। ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর যে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সূত্রপাত হয়েছিল তা যেন মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যেতে বসেছে। পুরো বিষয়টিই দিন দিন জটিল হচ্ছে। অথচ সমাধানের পথে কেউ অগ্রসর হচ্ছে না—এখানেই আমার আশঙ্কা।

www.pathagar.com

ফিরে আসি ৯টি শিক্ষাবোর্ডের ফলাফল প্রসঙ্গে। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, এ বছর ৭টি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীন অংশগ্রহণকারী মোট ৪ লাখ ১২ হাজার ২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। সব শিক্ষাবোর্ডের গড় পাসের হার ৬৩.৯২ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৫৯.১৬ শতাংশ। এর আগের বছর ছিল ৪৭.৭৪ শতাংশ। ৭টি শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে ঢাকাবোর্ডে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ১ লাখ ৩২ হাজার ১৯ জন, সর্বনিম্নসংখ্যক ছিল সিলেট শিক্ষাবার্ডে—মাত্র ১৮ হাজার ৯১৮ জন। উত্তীর্ণের দিক থেকে ঢাকাবোর্ড শীর্ষে—৯৮ হাজার ৬৯১ জন অর্থাৎ ৭৪.৭৬ শতাংশ। এই বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৮৩৭ জন, জিপিএ ৫<৪ পেয়েছে ২৪ হাজার ৬২১ জন, ৪<৩.৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ৫২২ জন। এ বছর যশোর শিক্ষাবোর্ডে শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষাবোর্ডের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের পাসের হার ৫৪.৪০ জন। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার ৫৬.৭৬ জন। সবকটি শিক্ষাবোর্ডে জিপিএ-৫-এর সংখ্যা মোট ৯ হাজার ৪৫০ জন। অপরদিকে দেশের একমাত্র মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আলিম, ফাজিল এবং কামিল পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ তথা আলিম পরীক্ষায় ৭৫.২৩ শতাংশ, ফাজিল পরীক্ষায় ৭৮.৫১ শতাংশ এবং কামিল পরীক্ষায় ৯৪.৬৪ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৫ হাজার ২৬৪ জনের মধ্যে ৩০ হাজার ৬৯২ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের পাসের হার ৬৭.৮ শতাংশ।

এ-বছর এমন চমকপ্রদ ফলাফলের বিষয়টিকে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী, বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ধরনের সাফল্য হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ঐদিন একটি সংবাদ-সম্মেলন ডেকে সাফল্যের অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি এ-বছরের সাফল্যকে ১৯৪৭ সালের পর সবচেয়ে বড় বলে অভিহিত করেছেন। তবে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম মাদ্রাসাশিক্ষায় পাসের হার ১০০ ভাগ হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করায় সাংবাদিকগণ জানতে চেয়েছিলেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে এমন কী গুণগত পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে মাদ্রাসায় পাসের হার ১০০ ভাগ হবে। তিনি জবাবে দাবি করেন যে, মাদ্রাসাগুলোতে আগের তুলনায় ভালো পড়াশোনা হচ্ছে। ভালো কথা, আগে যদি পড়াশোনা খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তো ছাত্রছাত্রীরা বেশ দুর্বল পড়াশোনা নিয়েই উপরের শ্রেণীতে উঠেছে। সেই দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের এমন কী জাদুকরি জ্ঞান দেওয়া হল যার ফলে উপরের শ্রেণীতে এসে তারা রাতারাতি প্রায় শতকরা পাস করতে পারে? যে ছাত্র প্রাথমিক স্তরে অঙ্ক ও ইংরেজির মতো বিষয়ে দুর্বল পড়াশোনা করে আসে, সেইছাত্র মাধ্যমিক স্তরে ৫ বছর জানপ্রাণ দিয়ে খাটলে তবেই কেবল কোনোপ্রকারে পাস করার আশা করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে কেউ যেন

www.pathagar.com

এসব যুক্তি, তথ্য ও বাস্তবতা মানারও নেই, শোনারও নেই। যার যা-খুশি তা বলতে, দেখতে ও বিশ্বাস করতে বা করাতে সবাই যেন বদ্ধপরিকর। লেখাপড়াও যেন তাদের কাছে বাজারে আলু-পটল তরকারির মতো রাতারাতি সরবরাহ বাড়ানো-কমানোর বিষয়। এটি-যে দীর্ঘ অনুশীলনের, দীর্ঘ প্রস্তুতির বিষয়; এখানে রাতারাতি কোনো বড়ধরনের সাফল্যের বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না তা যেন কেউ বুঝতে চায় না। যদি কোনো বিস্ফোরণ দেখানো হয়—তা কেবল কৃত্রিমভাবেই ঘটানো সম্ভব, অস্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেই তবে তা করা সম্ভব; অন্য কোনো উপায়ে নয়।

আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ, আমলা এবং তাদের দুর্বৃত্ত সহযোগীরা শিক্ষাদীক্ষা ও লেখাপড়ার স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ পথকে এড়িয়ে বা মাড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল প্রয়োগ করেই সেইসব সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে বেশ পারদর্শী। কথায় বলে, 'দুষ্ট লোকের দুষ্টবুদ্ধির অভাব হয় না'। আমাদের দেশে রাজনৈতিক শক্তির ইচ্ছায় এসব দুষ্ট লোকেরা রাষ্ট্রের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো শিক্ষাব্যবস্থাকেও একে একে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষাতেও এমন 'ইঞ্জিনিয়ারিং' করা হচ্ছে, ফলাফলকে উপরের দিকে উঠিয়ে আনার নানাধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেমন প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নেওয়া হচ্ছে এমন সব পদ্ধতি যাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আশাতীত ভালো ফলাফল কোনো সমস্যা না হয়।

এ প্রসঙ্গে আমি পাঠকদের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। আমাদের ছেলেমেয়ে যারা অপেক্ষাকৃত সুনাম-অর্জনকারী স্কুল বা কলেজে পড়ছে সেখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা এবং টেস্ট পরীক্ষায় যে-ধরনের প্রশ্নপত্র তাদের অতিক্রম বা উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়, পাবলিক পরীক্ষায় তাদের প্রশ্নপত্রের মানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষায় সেই মানের প্রশ্নপত্র করা হলে খারাপ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মোটেও পাস করবে না। এই যুক্তি মেনে নিলে যে-সত্যটি স্বীকার করে নিতে হবে তা হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষা হচ্ছে বিশেষ পরীক্ষা যেখানে দুর্বলদের উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত থাকবে, সেই মানে প্রশ্নপত্র করতে হচ্ছে। তাহলে তো মেধার যাচাই-বাছাই তেমন একটা হচ্ছে না। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পরীক্ষায় পাসের হার বেশি দেখাতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা কী শিখল, কী দক্ষতা তারা অর্জন করল—তা কিন্তু মোটামুটি মানে বের করে আনা হচ্ছে না। সে-কারণেই দেখা যাচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, যাদের সঙ্গে কথা বলে বিশ্বাস করা কঠিন যে তারা এসএসসি, এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করে এসেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এটি একটি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। তারা প্রচুর ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে যারা এসএসসি, এইচএসসিতে 'ভালো' ফলাফলের সার্টিফিকেট নিয়ে

www.pathagar.com

এসেছে। তাই ঐসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসব ছাত্রছাত্রীদের নির্বিচারে ভর্তি করাতে পারছে। ছেলেমেয়েরাও খুশি. তারা বেসরকারি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাতীয় হলেও বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানে অন্তত ভর্তি হতে পারছে। এতেই তাদের সান্ত্বনা ও সন্তুষ্টি!

বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজসমূহ (২০০-এর মতো) চলছে অপরিকল্পিত, অপ্রস্তুত, যোগ্যশিক্ষকহীনভাবে, সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের দাপটে, ভর্তিবাণিজ্যে। প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কোনো বাস্তবতাই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই। তারপরও এর ছাত্ররা সবাই পাস, অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে উপজেলা পর্যায়ে এখন আর কাউকে পাওয়া যাবে না বিশ্ববিদ্যায়ে ভর্তি হতে যাদের কোনো সমস্যা হবে। কেননা সেখানে সরকারি দলের নেতাকর্মী, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বাররা আছেন—যাদের হুকুম তামিল না করলে কোনো উপাচার্য সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।

পাবলিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় অপর ইঞ্জিনিয়ারিংটিকে খুবই উদ্ভাবনীসমৃদ্ধ বলা যেতে পারে। আগে দুই-আড়াইশো উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের ২১ দিন সময় দেওয়া হত। এখন তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশের (সময়মতো নয়, তাড়াতাড়ি) ধুয়া তুলে পরীক্ষকদের সময় দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১৪ দিন। যারা উত্তরপত্র মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা রাখেন তারা জানেন যে একজন শিক্ষক তার চাকরি ও সংসারের কাজ সম্পন্ন করে এই ১৪ দিনে এত বিপুলসংখ্যক উত্তরপত্র কোনোভাবেই মূল্যায়ন করতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু পরীক্ষকদের হুকুম পালন করতে হচ্ছে, সুতরাং তারা যেভাবে পারছেন তাদের দায়িত্ব সেভাবেই সম্পন্ন করে দিচ্ছেন। একটাই ধুয়া তোলা হচ্ছে—তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশ করতে হবে। কেন তাড়াতাড়ি—সময়মতো নয়? তাড়াতাড়ি বলা হলে পাবলিক খুশি হবেন যে সরকার তাড়াতাড়ি পরীক্ষার ফল দেওয়ার ব্যবস্থা করছে, সত্যিই সরকার আন্তরিক, দক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের মূল্যায়নে যে ফাঁকিজোকিটা থেকে গেল, যার ফলে প্রকৃত মূল্যায়ন থেকে তারা বঞ্চিত হল—সেই প্রশ্ন এদেশে এখন কে করবেন?

আসলে এভাবে ঘোড়া দাবড়িয়ে কোনো দেশের এতবড় পাবলিক পরীক্ষাকে পরিচালনা করা হলে তাতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই সফল না হয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা, দক্ষতা লাভ তথা সর্বোপরি ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠা। আমাদের দেশে কঠিন সেই

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে আমাদের শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অভিভাবকসহ আমরা সবাই কতটা সচেতন তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা পাবলিক পরীক্ষার ফলটাকে যতবড় সাফল্য হিসেবে দেখি; ছাত্রছাত্রীদের সাংবাৎসরিক শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া, মানসম্মত পাঠ্যবই পাঠের নীতি অনুসৃত হচ্ছে কিনা, ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনীয় লেখাপড়া স্কুল, কলেজ ও বাড়িতে পাচ্ছে কিনা তার দিকে তেমন এটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। ফলে যে-প্রক্রিয়ায় আমাদের পাসের হার ১০০ ভাগকে ধরতে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের শতকরা ১০০ ভাগ পাস করা, উত্তীর্ণ, কৃতী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে বড়ধরনের ধস নামতে যাচ্ছে—তা দেখার জন্য বোধহয় আমাদেরকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্বকে লঘু করে, বাদ দিয়ে শুধু পরীক্ষা পাস, জিপিএ-৫ সহ শতভাগ সাফল্যের মোহে তাড়িত ও ধাবিত হলে সম্ভাবনায় তরুণসমাজ তথা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎই বড়ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে আমার আশঙ্কা। এ আশঙ্কা বাস্তবায়িত না হোক সেই কামনাই করব।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

১৯৯২ সালে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের মধ্যদিয়ে দেশে সর্বপ্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হয়। দেশে শিক্ষাসচেতন মানুষের একটি অংশ এটিকে তখন স্বাগত জানিয়েছিল এই ভেবে যে, এর ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর একদিকে উচ্চশিক্ষার চাপ কিছুটা কমে আসবে, অন্যদিকে যাদের কিছুটা অর্থকড়ি আছে তাদের ছেলেমেয়েদের আর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে পাড়ি জমাতে হবে না। তা ছাড়া অন্য একটি ভাবনাও এ মহলের মনে ছিল যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হয়তো একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। দেশের শিক্ষাসচেতন অপর একটি অংশ গোড়াতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান ছিল, তাদের মধ্যে এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও ছিল। তারা তখন যে-কথাটি বলেছেন তা হচ্ছে এগুলো শেষপর্যন্ত উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে উচ্চলাভের ব্যবসাবাণিজ্যেই অধিকতর মনোযোগী হবে। এখন মনে হচ্ছে শেষের আশঙ্কাটিই কার্যকর হতে যাচ্ছে বেশি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাসের পর একযুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৫৪টিতে এসে দাঁড়িয়েছে, অননুমোদিত অথবা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে আরো বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেভাবে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার হিড়িক পড়ে গেছে তা দেখে সবাই কমবেশি বিস্মিত হতে থাকে। যে দেশে ৮০-৯০ বছরে গোটা ২৫-২৮টির বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে, সে দেশেই ৪-৫ বছরে ৪০-৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেছে। একই বিল্ডিং-এ ৪/৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড শোভা পেতে দেখে মনে হচ্ছে এ তো দেখি কোচিং সেন্টার খোলার চাইতেও সহজ কিছু! নিজস্ব কোনো ক্যাম্পাস নেই, ভবন নেই, শিক্ষক নেই, প্রশাসন নেই অথচ বাহারি নামের অসংখ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি মহল আলু-পটল তরকারি ব্যবসার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে ধরে নিয়েছে। উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে তেমন কোনো সম্পৃক্ততা নেই, জ্ঞানবিজ্ঞান ও গবেষণার সঙ্গে ন্যূনতম সম্পর্ক নেই—এমন ব্যক্তিদের কেউ কেউ কিছু পুঁজি খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছেন এমন অভিজ্ঞতাও আমাদের কম হয়নি। এ পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী এবং সচেতন মহল কিছুটা আশা ও ভরসার কথা শোনালেও বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই মানহীন শিক্ষার আয়োজন নিয়ে ছাত্র ভর্তি করাচ্ছে; হয়তো মানহীন, জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন উচ্চতর শিক্ষার সনদপত্রও দিচ্ছে বা দেবে।

প্রশ্ন হচ্ছে : কেন এবং কীভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতেই এমনটি হল? এর উত্তরে বলা যায় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি পাসের পর ইউজিসি ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দিক থেকে দুর্বলতা ও ঘাটতি যেটি ছিল তা হচ্ছে—বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, তাদের শিক্ষাক্রম পরিচালনার নিয়মনীতি প্রণয়নে যে-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিল তা দেখানো হয়েছে বলে মনে হয় না। ফলে আইন ও নিয়মনীতির ফাঁকফোকর দিয়ে যথার্থ উদ্যোক্তার চাইতে রাজনৈতিক বিবেচনায় ও পরিচয়ে দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য, অসৎ, কম-শিক্ষিত, কম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একশ্রেণীর ব্যবসায়ী এ-খাতে বেশিসংখ্যক ঢুকে পড়েছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সেন্টারের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। প্রায় সব কটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিবিএ, এমবিএ, ইংরেজি এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত কয়েকটি প্রোগ্রাম পড়ানো হচ্ছে বা রয়েছে যা বিশ্ববিদ্যালয়-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা, লাইব্রেরি বা গবেষণার সুযোগ থাকবে না তা কিছুতেই হয় না, বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এসবের কিছুই নেই। তা ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রভর্তিতে কোনো মান, নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছে না। পরীক্ষা ও পঠন-পাঠনে নামীদামি বিদেশি পদ্ধতির কথা বলা হলেও কার্যত ছাত্রছাত্রীদের তুষ্টির ওপরই তাদের দৃষ্টি বেশি থাকে; ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলা, মানসম্মত পাঠদান করা, পরীক্ষাপদ্ধতির ভেতর দিয়ে যাচাই-বাছাই করাটি মোটের ওপর অনুপস্থিত। ফলে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বলতে তেমন কিছু নেই। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে নামেমাত্র পাস করে আসা দুর্বল মানের ছাত্রছাত্রীদের ভরসার স্থল হিসেবে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচিত হচ্ছে। বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে দুর্বল মানের অথচ অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের ছেলেমেয়েদের ওপর—যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে না, করলেও নির্বাচিত হতে পারছে না। প্রতিযোগিতার একটি ব্যবস্থা হাতেগোনা ৩/৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশেই তা নেই; সেগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং এ-ধরনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশ ও জাতির কী আশা পূরণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আসলে প্রয়োজন সুষ্ঠু, যুগোপযোগী নিয়মনীতি, মান নির্ণয় ও ধরে রাখার কার্যকর ব্যবস্থা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ধারণার চাইতে কোনো অংশেই নিচে হবে না।

৩০ জুলাই ২০০৬, আমাদের সময়

www.pathagar.com

নামে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে, বাস্তবে উচ্চশিক্ষা উবে যাচ্ছে

বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। ঢাকা শহরে তো নানা বাহারি নামে বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাইনবোর্ড যত্রতত্র দেখা যাচ্ছে, একই রাস্তায় একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও চোখে পড়ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ' নামক একধরনের নামফলক মফস্বল শহর, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামটি যতদ্রুত মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তত তাড়াতাড়ি যেন এর সম্পর্কে দেশের মানুষের মধ্যে একসময়কার ভক্তি-শ্রদ্ধা, সম্মান, বিশ্বাস এবং আস্থায় সংকটও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন দেশের পত্রপত্রিকায় কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হয় খবর থাকে, নতুবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন থাকে। তবে যেসব খবর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় তার বেশিরভাগই হচ্ছে কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি, ভাংচুর, দখল, নির্যাতন, অনিয়ম, দুর্নীতি, ঘুস, অবৈধ নিয়োগ বাণিজ্য, সেশন জট ইত্যাদি সম্পর্কে। না, দেশের মানুষের চোখে এ-পর্যন্ত এমন কোনো সুসংবাদ পড়েনি যা পড়ে তারা পুলকিত হতে পারেন। দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে গর্ব করতে পারেন, অথবা এমন কোনো মৌলিক গবেষণা বা আবিষ্কারের সংবাদ দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও দিতে পারেনি যা দেশে বা দেশের বাইরে কোথাও প্রশংসিত হয়েছে, বা প্রচার পেয়েছে।

দেশে আসল স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ' ধারার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মানসম্মত কোনো শিক্ষা দিতে পারছে না, দিচ্ছে না। পুরোপুরি ব্যর্থই বলা চলে। দিন দিন এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যেসব খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, বেতার-টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হচ্ছে, তাতে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিই বেশি থাকে। বস্তুত দেশে উচ্চশিক্ষার নামে নানা ধারা, উপধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির চাইতে বেশিই চলছে উচ্চশিক্ষার মানের ক্ষেত্রে গভীর সংকট ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা। লেখাপড়া ও গবেষণার কোনো বালাই নেই স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক বিশেষ ধারার

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে ঢিলেঢালাভাবে; দলবাজি এবং দখলদারিত্বই এগুলোতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগই দোকানদারির মানসিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে' না আছে শিক্ষা, না আছে বাণিজ্য। তবে সবক'টি ধারার বিশ্ববিদ্যালয়েই চলছে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট প্রদান, যা নিয়ে এখন আমরা পড়তে যাচ্ছি মস্তবড় পরিচয় সংকটে—এমনটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

উপরে আমি যে-কথাগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, আর তা হচ্ছে দেশের উচ্চশিক্ষার কোনো মানসম্মত নীতিমালা নেই। নীতি-পরিকল্পনাহীনভাবে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা চলছে। দেশে একসময় স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকটি, এখন কিন্তু সেই সংখ্যাও বেড়ে প্রায় ৩০-এর কাছাকাছি চলে এসেছে। আরো বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনায় অচিরেই চালু হতে যাচ্ছে।

এগুলোর চালচলন দেখে আমার মনে হয় এগুলো না স্বায়ত্তশাসিত, না সরকারি। আসলে কোন্ নিয়মে এগুলো চলে তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। কোনোটাতেই বিশ্ববিদ্যালয় আইন যথাযথভাবে কার্যকর নেই। বলা হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় হবে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সর্বোচ্চ কেন্দ্রবিন্দু এবং মুক্তবুদ্ধিচর্চার তীর্থস্থান। বিশাল সেই দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে মোটেও পালন করেনি। পৃথিবীর উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান—যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার, লাইব্রেরি এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধনায় বিকশিত হচ্ছে, এগিয়ে চলছে—আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেই উচ্চতর অ্যাকাডেমিক ধারণাই স্থান পায়নি। সেই স্থানে বাসা বেঁধেছে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি, ধান্ধাবাজি, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখিনতা, স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের চরম অপব্যবহারের মাধ্যমে এগুলোতে বাসা বেঁধেছে স্বৈরাচারী ও স্বার্থবাদী একটি গোষ্ঠী যাদের সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান ও মেধা-বিকাশের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন এবং ক্যাম্পাস দখল করে লুটেপুটে খাচ্ছে সরকারের আজ্ঞাবাহী শিক্ষক এবং ছাত্রসংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আসলে কতটুকু তা নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে। সে-কারণেই অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কেউ কেউ টাকাপয়সার বিনিময়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেছেন; সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, টেন্ডার এবং নিয়োগ-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। এ নিয়ে বিরোধ ঘটলেই ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও ঘটে—যেমনটি ঘটেছে বেশ ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্যের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে নিয়োগদান এবং দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগের ঘোরতর অভিযোগ উঠেছে। এমনকি নারী-কেলেঙ্কারির মতো বিষয়ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বলতে গেলে শূন্যের কোটায় নেমে গেছে। অপরদিকে ১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় বিত্তের প্রয়োগ এবং গুরুত্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এছাড়া বিদেশীনামধারী বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও দেশে দেখা যাচ্ছে।

একসময় মনে হয়েছিল ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করতে যাওয়ার ফলে যে বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে চলে যাচ্ছে তা অন্তত এর ফলে বন্ধ হবে; উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তের সন্তানগণ অর্থকড়ি দিয়ে দেশেই বসে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হবে। তাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট, ছাত্র-ধর্মঘট, মারামারি ইত্যাদির ফলে যেভাবে পিছিয়ে পড়ছে তাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতার বিষয় উচ্চশিক্ষায় চলে আসবে। কিন্তু সেভাবে বিষয়টি বেশিদূর এগোয়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনকে গভীরভাবে পর্যালোচনা না করে যেভাবে দ্রুত কার্যকর করা হল তাতে বিত্তশালী, ফড়িয়া, সুবিধাবাদী, প্রভাবশালী, দুর্নীতিগ্রস্ত একটি বণিকগোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার নামে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা না করে কতগুলো 'বাড়ি ভাড়া' নেওয়া শুরু করেছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যাদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, যারা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষায় শিক্ষিত কিনা সন্দেহ আছে, জ্ঞানবিজ্ঞানে যাদের আদৌ কোনো বিশ্বাস নেই, তাদেরও কেউ কেউ বাহারি নামে এক-একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে দিয়েছে—এখানেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেহাতে চলে গেছে।

এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে কীভাবে অনুমোদন লাভ করেছে তা সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম একটি বিস্ময় সৃষ্টির মতো ঘটনা। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব ক্যাম্পাস-শিক্ষক, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাব এবং লাইব্রেরি নেই। শিক্ষার কোনো মান দেওয়ার মতো ক্ষমতা, যোগ্যতা, চিন্তাভাবনা, আয়োজন ও ধারণা এদের অনেকেরই নেই। একটি কিন্ডারগার্টেন চালানোর অভিজ্ঞতাও কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকারীদের কারো-কারো ছিল না বা নেই। অথচ চমকপ্রদ সব বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। সেগুলোতে নামকাওয়াস্তে সেমিস্টার আছে। মিডটার্ম, ক্লাসটার্ম ইত্যাদি পরীক্ষার কথা থাকলেও শিক্ষার মানের কোনো চেষ্টা বা তাগিদ নেই। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের খুশি করা, ধরে রাখার প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠেছে। কোনো ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সৃষ্টি বা বৃদ্ধি না করেও সারাবছরই গণহারে ছাত্রভর্তির প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যেটুকু আশাবাদ শুরুর দিকে তৈরি হয়েছিল তা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। এখানেও দলীয় রাজনীতি, প্রভাব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি, অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা, সীমাহীন ভূমিকা রেখেছে। হাতেগোনা যে-কজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারত তারাও এখন অশুভ নানা চক্র এবং হীন প্রতিযোগিতায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

তাছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস, ফ্যাকাল্টি, ল্যাব, কারিকুলাম, লাইব্রেরিসহ জ্ঞানচর্চার যেসব আয়োজন থাকতে হয় তার কিছুই আমাদের কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ধারণ করেনি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বায়ত্তশাসিত, নাকি বেসরকারি, নাকি অন্যকিছু—সেটি তেমন বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রধানত দেখার বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা আছে কিনা, সুযোগসুবিধা আছে কি না, সেগুলো অব্যাহত আছে কিনা এবং এখান থেকে যে-মানুষগুলো উচ্চতর শিক্ষার ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে তারা দেশ, সমাজ এবং বিশ্বপরিসরকে আলোকিত করার মতো যোগ্যতা অর্জন করছে কি না। আমরা এর কিছুই আমাদের স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাচ্ছি কিনা। আমাদের বেসরকারি বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন বিবিএ, এমবিএ, ইংরেজি, কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদির কয়েকটি সীমিত বিষয়ে ছাত্র ভর্তি করাচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ কোনো জ্ঞান শাখা থাকবে না, চর্চা হবে না—এটি কল্পনা করাই অবাস্তব।

দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি 'ব্যতিক্রমধর্মী' বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সাল থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু আদলটা বাংলাদেশ গ্রহণ করলেও এর সারমর্ম, ধারণা ও কার্যকারিতা গ্রহণ না করে গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চরিত্র প্রদান করা হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রাণই এতে বিন্দুমাত্র নেই। এটিকে মানুষ দেশে কলেজসমূহের সর্বোচ্চ একটি 'বোর্ড অফিস' বলে ঠাট্টা-মশকরা করে থাকে। অদ্ভুত কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের কলেজ পর্যায়ে হরেক রকমের বিভাগ খোলার অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে—যেখানে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ল্যাব, লাইব্রেরিসহ কোনো সুযোগসুবিধাই নিশ্চিন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এক একটি কলেজে অনার্সকোর্সের অনুমোদন দেয়া হলেও ছাত্রশিক্ষকের অনুপাত ও বইপুস্তকের কোনো সুযোগসুবিধাই বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলো নিশ্চিত করতে পারছে না। ফলে যে মান নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় ২০০ কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সনদ পাচ্ছে তার অ্যাকাডেমিক মান নিয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েই যাচ্ছে।

www.pathagar.com

এখন বোধহয় আমাদেরকে ঠিক করতে হবে যে আমরা জাতীয়ভাবে উচ্চশিক্ষা বলতে শুধু অনার্স ও মাস্টার্স পাস সনদকেই বুঝব; নাকি উচ্চতর শিক্ষা ও দক্ষতায় বেড়ে ওঠা, মেধাবী, উচ্চতর মূল্যবোধ ও বিবেচনাবোধে পরিচালিত সৃজনশীল জনশক্তিকে বুঝব। দেশে এখন যে ২৭/২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাতে বছরে কমপক্ষে ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী স্নাতক কোর্সে ভর্তি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৫০ হাজার এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে কমপক্ষে ৭০/৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে। এছাড়া কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

সবকটি পরিসংখ্যান দেখে আমাদের তো রীতিমতো উল্লসিত হওয়ার কথা। প্রতিবছর এইচএসসি পরীক্ষায় দেশব্যাপী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও আমাদের ২ থেকে আড়াই লাখের বেশি নয়। অথচ আমরা প্রায়ই বলতে শুনি যে, যে-পরিমাণ ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর এইচএসসি পাস করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নাকি সেই অনুপাতে আসন নেই। 'আসন নেই' কথাটি সবসময় ব্যাখ্যা করে বলা হয় না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিপরীক্ষাটি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ায় সবসময়ই বেশকিছু বিভাগে আসন ফাঁকা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণের চাইতে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা বেশি। এই অনুত্তীর্ণদের বড় অংশই চলে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে যেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাইতে শিক্ষক, বইপুস্তক, ল্যাবসহ শিক্ষাক্রমের সুযোগসুবিধার বিস্তর ঘাটতি রয়েছে।

প্রকৌশল, চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ-মুহূর্তে প্রত্যাশিত মানের ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরো যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেগুলোতে মানসম্মত ছাত্রছাত্রীর অভাব যে বাড়বে সেই আশঙ্কাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ তো গেল উচ্চশিক্ষা নিয়ে সমস্যার একদিক। গুরুতর অপর দিকটির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টিপাত করার কথা বলব। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই মেধাবী, দক্ষ শিক্ষকের দারুণ সংকট চলছে। বেশ কয়েক বছর থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষকনিয়োগের যে অপধারা চলে আসছে তার ফলে বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম শিক্ষকের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগবিধির একদিকে অপব্যবহার হচ্ছে, অন্যদিকে প্রথমশ্রেণী প্রাপ্তি দারুণভাবে সহজতর করা হয়েছে।

এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের মান চরমভাবে নেমে পড়েছে। এর উপরে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব এবং দলবাজির চর্চা যা বেশিরভাগ শিক্ষককে

www.pathagar.com

গবেষণা, লেখাপড়ার চর্চা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। দলীয় আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও সুযোগসুবিধা লাভের মতো বিষয়গুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলামের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অনেক অমিল ঘটার পরও পুরাতন কারিকুলাম নিয়ে পড়ে থাকা, শ্রেণী-পাঠদানে মান রক্ষা না-করা, ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা, তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জ্ঞানে তৈরি না-করা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার চর্চা, গবেষণা, তত্ত্বীয় আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম থাকবে নিয়মিত বিষয় হয়ে। কিন্তু ঐ বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অসাধারণ, অস্বাভাবিক, কালেভদ্রে দেখা কোনো ভোজনবিলাসী তর্জনগর্জনসর্বস্ব অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠেছে নামসর্বস্ব; বাস্তব কোনো উচ্চশিক্ষা, গবেষণা কিংবা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। বেসরকারি এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ'গুলোর অবস্থা সেক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে নেয়াই যাচ্ছে না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় আইন, কারিকুলাম, শিক্ষক নিয়োগ ও গবেষণার বাধ্যবাধকতাকে যুগোপযোগী করা; দলীয় বিবেচনায় নয়, কেবলমাত্র মেধাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ ও ভর্তির একমাত্র পরিমাপক—এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

নাম ও পরিচিতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পৃথক হতে পারে, কিন্তু অ্যাকাডেমিক কারিকুলামের মান, গবেষণার বাধ্যবাধকতা, লেখাপড়ার সুযোগসুবিধার নিশ্চয়তা পাবলিক, বেসরকারি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কোনো ক্ষেত্রেই ঘাটতির সুযোগ থাকবে এমনটি মেনে নেওয়া যায় না। এর জন্য আমাদের শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকসমাজ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইউজিসি, শিক্ষামন্ত্রণালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদেরও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে; শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার বই-পুস্তকের অভাব পূরণের উদ্যোগ নিতেই হবে। মনে রাখতে হবে, উচ্চতর লেখাপড়া দেশকে আধুনিক দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে থাকতে সাহায্য করে থাকে। আর সেজন্য প্রয়োজন আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার আয়োজন করা যা আমাদের থাকতেই হবে।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সবধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মানে উন্নীত করাও সম্ভব। এর জন্য একবিংশ শতাব্দীর যুগোপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৯ মে ২০০৬, দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষার মান বেড়েছে কি?

দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, ১টি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং ১টি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিত এ-বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল গত ২২ জুন দেশব্যাপী একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এ-বছর (২০০৬) পাসের হার এসএসসিতে ৫৯.৪৭, দাখিলে ৭৫.৮১ এবং কারিগরিতে ৬১.৩৭ জন। মোট ৯টি শিক্ষাবোর্ডের অধীন এ বছর সর্বমোট ১০ লাখ ৫৬৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৮৬ জন। এর মধ্যে এসএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩২ জন। এ-বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে রেকর্ড-সংখ্যক অর্থাৎ ২৪ হাজার ৩৮৪ জন ছাত্রছাত্রী। এই ফলাফলে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সরকার বেশ খুশি।

জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং প্রত্যাশার চাইতেও ভালো ফল করা ছাত্রছাত্রীদের আনন্দকে আমাদের বিশেষভাবে মর্যাদা দিতে হবে। আমরা চাইব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে এর চাইতেও ভালো ফল করবে, জীবনে সাফল্যের ধারাবাহিকতা তারা অক্ষুণ্ন রাখবে। তবে অভিজ্ঞতা বলছে, আমাদের পাবলিক পরীক্ষার ফল একেক বছর একেক ধরনের স্বাদ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে যা সবসময় একরকম থাকে না। তাছাড়া শিক্ষাবোর্ড এবং শিক্ষার ধারাভেদেও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে থাকে, যেমনটি এ-বছর ঘটেছে। পরীক্ষার ফলাফলের এসব অস্বাভাবিক ওঠানামা, ব্যবধান এবং তারতম্য নিয়ে প্রায় প্রতিবছরই আমি প্রশ্ন তুললেও কেউ যেন বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারপরও সদ্যপ্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল নিয়ে নানা অসঙ্গতির প্রতি দেশের সুধীসমাজের আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেশে এখন ৭টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। এ-বছরে ঢাকা, রাজশাহী এবং যশোর শিক্ষাবোর্ড ছাড়া অপর চারটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখের নিচে, সিলেট শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ৩১ হাজার ২০০ জন। অথচ ঢাকা বোর্ডে এ সংখ্যাটি ছিল ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৫৫ জন, রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ১৭ হাজার ২৭৩ জন এবং যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩২ জন। পরীক্ষার্থী সংখ্যার এমন বিশাল তারতম্য নিয়ে শিক্ষাবোর্ডের ফলাফল নিয়ে কোনো তুলনামূলক আলোচনা করাই নিরর্থক বলে মনে হয়। দেশে রাজনৈতিক এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য বিবেচনা থেকে এভাবে শিক্ষাবোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটার সুবিধা একভাবে হলেও প্রতিযোগিতামূলক পাবলিক পরীক্ষার বোর্ডভিত্তিক বিভাজন কার্যত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদির মধ্যে অভিন্নতার পরিবর্তে বেশ বড়ধরনের বৈষম্য এবং বিভিন্নতা নিয়ে এসেছে। সে-কারণে দেখা যাচ্ছে যে, এক বোর্ডে অঙ্কের প্রশ্নপত্র একরকমের হয়েছে তো অন্য বোর্ডের প্রশ্নপত্র অন্যমানের হয়েছে। দেশে একই বছর একই পাঠ্যবইয়ের ওপর একই সময় অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র হচ্ছে, উত্তরপত্রও ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। অথচ এই ছাত্রছাত্রীরাই পরবর্তী শিক্ষাজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে দেশের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের সনদ নিয়ে অভিন্ন ভর্তি-পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

এক শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার কোনো বিশেষ বিশেষ প্রশ্নপত্রের কারণে কম বা বেশি হতে পারে, নম্বরেও তারতম্য ঘটতে পারে। এ-বছর অবশ্য সাধারণ একটি ধারণা পাওয়া গেছে যে, সবকটি বোর্ডের প্রশ্নপত্র সহজ করা হয়েছে। জানি না কী বিবেচনা থেকে এমনটি করা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে নির্বাচনী বছরের বিশেষ ছাড় ও বিশেষ সুযোগ বলে অভিহিত করতে চান এবং এ-বছরের আশাতীত ফলকেও অনেকে তাই নির্বাচনী ফল বলেও অভিহিত করতে চাচ্ছেন। এসব অভিযোগের সত্যতা আমরা জানি না। তবে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রথম বছর ২০০১ সালে এসএসসিতে দেশব্যাপী জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৭৬ জন, ২০০২ সালে ৩২৭ জন, ২০০৩ সালে ১ হাজার ৩৮৯ জন, ২০০৪ সালে ৮ হাজার ৫৯৭ জন, ২০০৫ সালে ১৫ হাজার ৬৩১ জন এবং এ-বছর ২০০৬ সালে তা ২৪ হাজার ৩৮৪ জনে উন্নীত হয়েছে। তা হলে কি বলব ২০০১ সালের পরীক্ষার্থীরা একেবারেই মেধাহীন ছিল, এ-বছরের ছাত্রছাত্রীরা বেশি মেধাবী? মেধাকে বছরভিত্তিক এভাবে নির্ণয় করা সম্ভব কি? এটি আদৌ করা উচিত কি?

তাছাড়া এ-বছর চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার ৬৩.৮৭ জন, অপরদিকে সবচেয়ে কম পাসের হার হয়েছে যশোর শিক্ষাবোর্ডের অর্থাৎ ৪৮.৫০ জন। এই তারতম্যের গ্রহণযোগ্য কোনো জবাব কেউ দিচ্ছে না। তাছাড়া এ-বছর মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৭৫.৮১ জন—যা মাধ্যমিক স্তরের এসএসসি এবং কারিগরিদের চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে কি বলব, বাংলাদেশের সব সাধারণ বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চেয়ে দেশের মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি মেধাবী বা সেখানে লেখাপড়ার মান খুব ভালো? এমন প্রশ্নের জবাবে আমরা কি শিক্ষার মানের বাস্তব চিত্রটি এমনই পাব? যদি তা না হয় তাহলে পরীক্ষার ফল কিসের মান বহন করে—এমন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

দেশে আমরা এসএসসির সঙ্গে দাখিল এবং কারিগরিকে সমমানের ডিগ্রি দিচ্ছি। অথচ এদের পাঠক্রম আলাদা, পাঠ্যপুস্তক আলাদা, শিক্ষাবোর্ড আলাদা,

www.pathagar.com

পরীক্ষাও নেওয়া হয় আলাদাভাবে। বরাবরই মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের পাসের হার সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের এসএসসির চেয়ে অনেক বেশি থাকে, কিন্তু উভয় বা এই তিনধারার শিক্ষার্থীরা যখন দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, মাদ্রাসা কিংবা কারিগরি বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরাই তাতে সবচেয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে; তাদের টিকা থাকা বা উত্তীর্ণ হওয়ার হার খুবই কম। অথচ আমরা তাদেরকে একই শিক্ষামানের সনদপত্র দিচ্ছি; আবার ভিন্ন ভিন্ন ধারা, শিক্ষাবোর্ড ও কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে রেখেছি। আমাদের কোন্ শিক্ষাবোর্ড কোন্ ধারার, শিক্ষার আসল মান কী, এর পরিমাপক কী—এসব প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর আমাদের জানা নেই। আমরা বোধহয় জানার চেষ্টাও খুব একটা করছি না।

আসলে আমরা শিক্ষা নিয়ে এসব কী করছি, কেন করছি—এর কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর কখনো খুঁজতে চেষ্টা করিনি, এখনো করছি না। বরং দিন দিন নানা স্বার্থচিন্তা, ভেদবুদ্ধি, সংকীর্ণ চিন্তা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে আমরা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছি বা রসাতলে ডুবতে দিচ্ছি। এই দেখুন না, এত ছোট্ট একটি দেশে মাত্র কয়েক বছরে কতগুলো শিক্ষাবোর্ড হয়ে গেল! কেন হল? শুনেছি আরো কয়েকটি হওয়ার পাইপলাইনে আছে। কেন নতুন শিক্ষাবোর্ড হচ্ছে বা হবে, এর ফলে কী লাভ, কী ক্ষতি হবে—কেউ তলিয়ে দেখছে না। আমরা পারতাম দেশব্যাপী মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি মাত্র শিক্ষাবোর্ড রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে আঞ্চলিক শাখা বোর্ড অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত করতে। তাতে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের অধীন অনুষ্ঠিত হলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা, ফল, পরবর্তী ভর্তিপরীক্ষা, শিক্ষাজীবনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ইত্যাদিতে বৈষম্যসৃষ্টির তেমন কোনো সম্ভাবনাই থাকত না।

আগেই বলেছি, প্রশ্নপত্র আলাদা হওয়ায় একই বছর এক বোর্ডের ছাত্রছাত্রীরা একধরনের ফলাফল করে তো অন্য বোর্ডের শিক্ষার্থীরা অন্যরকম করে। এই তারতম্য পরবর্তী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে যা কোনোমতেই কাম্য নয়। তাছাড়া সমমানের ডিগ্রির ক্ষেত্রে কোর্স কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার মান ইত্যাদিকে গুরুত্ব না দিয়ে মাদ্রাসা, স্কুল ও কারিগরি শিক্ষার পৃথক অবস্থান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভে বড়ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি করেই যাচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অপচয় দিন দিন বৃদ্ধি করেই চলছে যা সমন্বয় করা গেলে প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হত, যে-অর্থ সাশ্রয় হলে বা পাওয়া গেলে আমাদের এই পর্যায়ের শিক্ষার অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা সহজতর হত। যখন বিভিন্ন ধারার মধ্যে মানের সমতা চাওয়া ও দেওয়া হয় তখন কেন

www.pathagar.com

উভয় বা তিনটি ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্রম একীভূত করা হল না তা মোটেও বোধগম্য নয়। পাঠক্রম, শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রেখে কোনো স্তরেই শিক্ষার মান সমানভাবে নিশ্চিত করা যায় না।

তাছাড়া একই দেশে এত নিম্নপর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এতসব ধারা ও উপধারাকে একদিকে চলতে দেওয়া, আবার অন্যদিকে সমমানের ডিগ্রি দেওয়া কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, অথচ এগুলোতে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে রয়েছে আকাশ-পাতালসম পার্থক্য। এ-ধরনের ব্যবস্থা চালু রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বড়ধরনের কোনো অর্জন করা সম্ভব নয়। এত বছরেও তেমন কিছু অর্জিত হয়নি, আগামীতে কিছু হবে তা আশা করা যায় না। গরিব দেশের এমনিতেই যথেষ্ঠ অর্থ-সংকট রয়েছে। টাকার অভাবে শিক্ষকদের ভালো বেতন দেওয়া যাচ্ছে না, ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেওয়া যাচ্ছে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না; অথচ সেই দেশে প্রতিযোগিতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে একই গ্রাম বা পাশাপাশি গ্রামে একাধিক স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—যেগুলো আবার সমমানের ডিগ্রি প্রদানের দাবি করছে। গরিব দেশে এভাবে প্রতিযোগিতা দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবে কি? না! কোনো ব্যাখ্যাও নেই, যুক্তিও নেই।

এভাবেই বাংলাদেশে এখন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিযোগিতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—যেগুলোর বেশির ভাগই হতদরিদ্র, লেখাপড়াতেও পিছিয়ে পড়া, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, এ-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের সংখ্যা হাজার হাজার, যেগুলোর পেছনে সরকারি তহবিল থেকে প্রচুর অর্থকড়ি খরচ হচ্ছে অথচ মানসম্মত শিক্ষাদান করা ঐসব বেসরকারি মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজের পক্ষে মোটামুটি অসম্ভব। বাংলাদেশে অন্তত ১০/১২ হাজার এ-ধরনের মানহীন স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর যেসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাদের ফলাফল একেবারেই নিচে অবস্থান করছে, কেউ কেউ অকৃতকার্যের শীর্ষে অবস্থান করছে। কীভাবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমপিওভুক্ত হয়েছে, কারা ঐসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন, কেন ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে—এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বেশ কষ্টকর। আসলে জবাবদিহিতার কোনা বালাই শিক্ষাক্ষেত্রে নেই—এটিই বলে দেওয়া যায়।

অপরদিকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এখন শিক্ষার মান বৃদ্ধি হওয়ার যে দাবি করা হচ্ছে—তা কতটা পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা নিয়ে কিছু মাঠ-পর্যায়ের জরিপ হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। হ্যাঁ, নকলের প্রভাব কমে যাওয়ার ফলে আগের তুলনায় ছাত্রছাত্রীরা অনেকটা বইমুখী হয়েছে। তবে দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই মানসম্মত শিক্ষকের দারুন সংকট রয়েছে। কোচিং, প্রাইভেট

www.pathagar.com

পড়া, ব্যাচে পড়া, নানাধরনের গাইডবইয়ের প্রভাব ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। সত্যিকার শ্রেণী-পাঠ স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাগুলোতে খুব একটা বাড়েনি। শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের পেছনে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে কোচিঙের ব্যবস্থা করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো করার একটা প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীই এ-ধরনের বাড়তি খরচ করতে পারছে না, তাই তাদের পরীক্ষার ফল কেবলি খারাপ হচ্ছে। অধিকন্তু এখন পরীক্ষাপদ্ধতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, হচ্ছে—তাতে নম্বরপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। এসব কিছু দেখে চট করে বলে দেওয়া যাবে না যে, দেশের পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ির সঙ্গে মেধার বিকাশ রাতারাতি ঘটে গেছে। সেটি বোধহয় এভাবে ঘটা সম্ভব নয়। এর জন্য পাঠদান, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিসহ সবকিছুতে গুণগত মান বৃদ্ধির একটি সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই হবে—অন্য কোনো সংক্ষিপ্ত উপায়ে তা হওয়ার নয়।

www.pathagar.com

নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : মানোন্নয়ন করতেই হবে

কিছুদিন আগে শিক্ষাসচিব মো. শহিদুল আলম জানিয়েছিলেন যে, মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে দেশব্যাপী প্রায় ৩০ হাজার স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার মান এতই নিম্নে অবস্থান করছে যে, ঐগুলো বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। গত ২০ অক্টোবর সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে বক্তৃতাদানকালে এই তথ্যের উল্লেখ করে বলেছেন যে, সরকার উক্ত নিম্নমানের ১০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। দেশে এতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে—এ-ধরনের খবরে আমাদের দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি বাংলাদেশের মতো একটি দেশে মোট স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এক-তৃতীয়াংশ কীভাবে এত নিম্নমানের হল, জনগণের শত শত কোটি কোটি টাকা কীভাবে যুগ যুগ ধরে খরচ করা হচ্ছিল সেকথা ভেবে। একটা গরিব দেশে কীভাবে এমন অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হল, এর থেকে উত্তরণের পথ কী—বিষয়গুলো নিয়ে সত্যিই গভীরভাবে ভাবা দরকার। মানহীন শিক্ষার নামে চলা এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটি রূঢ়, দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া এখন আমাদের উপায় কী?

এই আলোচনায় প্রবেশ করার সুবিধার্থে আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। প্রসঙ্গগুলো হচ্ছে : নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হল বা হচ্ছে, কেন এগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে ব্যর্থ হচ্ছে, এ-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্য কী, কারা এর সঙ্গে জড়িত আছেন ইত্যাদি। যেসব উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় নিম্নমানের বা দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সে-সম্পর্কে সম্যক ধারণা অবশ্যই নিতে হবে, ঐসব অপতৎপরতা বন্ধ করা না-গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কোনো সমাধানও আশা করা যাবে না।

একটি বিষয় অবশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি যে, যে ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনার কথা শিক্ষাসচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী উভয়ে বলেছেন সেগুলো সরকারি নাকি বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ, নাকি উভয় ধরনের। তবে পত্রিকায় তাদের উদ্ধৃত করে যে সংবাদ ছাপা হয়েছে তাতে

www.pathagar.com

মনে হয়েছে যে, তারা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথাই বলছেন। আমি প্রথমে বেসরকারি, পরে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে কিছু ধারণা উপস্থাপন করব। আশা করি দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার মান নিয়ে দেশে দীর্ঘদিনের অভিযোগের কিছুটা উত্তর পাঠক খুঁজে পেতে পারেন। বলে রাখি আমরা শিক্ষার মান নিয়ে এই নিবন্ধে খুব একটা আলোচনা করব না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান কেন ও কীভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে সেটিই এ নিবন্ধে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু পরিসংখ্যান দিই। দেশে কেজি স্কুলের সঠিক পরিসংখ্যান সরকারের হাতেও নেই, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের কাছেও নেই। তবে কোনো কোনো সূত্র বলছে যে, কেজি স্কুলের সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক। এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬ হাজারের অধিক, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাও প্রায় ৬০ হাজার। আমার ধারণা শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব এসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হিসাব উক্ত ১০ হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেননা এই প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার থেকে কোনোপ্রকার অনুদান পায় না বা গ্রহণ করে না। যেহেতু সরকার এগুলোর দায়দায়িত্ব বহন করে না তাই এ-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকার কিছু বলতেও হয়তো চায় না, স্কুলগুলোও হয়তো তা সহজভাবে নেবে না। তবে এসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিতে গড়ে ওঠে না। দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে নার্সারি-কেজি স্কুল ও ধর্মীয় শিক্ষা দেশের অবহেলিত শিশুদের শিক্ষালাভে বেশ বড়ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতিতে গড়ে ওঠে না, পরিচালিত হয় না; তাই এগুলোর অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা, শিক্ষাদান, পাঠক্রমের মানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অভিন্ন কোনো পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নেই। তাই শিশুরা এক এক স্কুলে এক একভাবে, এক এক মানে শিক্ষালাভ করে থাকে। তাদের মানসিক বিকাশও সে-কারণে যথেষ্ট ভিন্নভাবে গড়ে উঠছে। শিক্ষাজীবনের একেবারে শুরুতেই এমন একটি বড়ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় দেশের অধিকাংশ শিশু। তাছাড়া দেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের সুযোগ পায় না বললেই চলে। এসব মৌলিক বৈষম্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে একটি বড়ধরনের সমস্যা হয়ে বিরাজ করছে। বেসরকারি কেজি স্কুল, এবতেদায়ী ও বিভিন্ন ধরনের এনজিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান, প্রকৃতি ও মানের তারতম্য দিয়েই শুরু হয় আমাদের দেশের কয়েক কোটি শিশুর শিক্ষাজীবন।

দেশে প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ২২ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনো সরকারি

www.pathagar.com

প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী। তবে ছাত্র-শিক্ষকের নির্দিষ্ট অনুপাত এগুলোর কোনোটিতেই মানা হচ্ছে না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদানেরও সুযোগ এগুলোতে নেই। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান এতই নেমে গেছে যে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই প্রয়োজনীয় শ্রেণীশিক্ষার মান অর্জন না-করেই উপরের শ্রেণীতে উঠে আসছে। এদের লেখাপড়ার ভিত্তি তাই অবিশ্বাস্যরকম দুর্বল থেকে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে মানুষ বলতে গেলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী হতেই চায় না। শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে সকলেই এই শিশুদের বেসরকারি কেজি বা বিভিন্ন ধরনের স্কুলে পড়াতে বাধ্য হচ্ছে। যদিও এই শিক্ষাটি বেশ ব্যয়বহুল, অনেকের পক্ষেই এটি নির্বাহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। আসলে মানুষের মধ্যে স্কুলের মান নিয়ে আস্থার সংকট রয়েছে, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুলেই ছেলেমেয়েদের পড়াতে হচ্ছে।

যে ২২ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেছি এগুলোর বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এগুলোর বেশিরভাগই এখন সরকারের অনুদান লাভ করছে; তবে এগুলোর প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগদান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নানাধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতির যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এসব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের খুব একটা আর্কষণ করতে পারেনি। অথচ গ্রামেও এখন বেসরকারি কেজি স্কুলের দিকে অবস্থাপন্ন পরিবারের মানুষ ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ এখন পয়সা বা অর্থের বিনিময়ে হলেও একটু মানসম্মত শিক্ষা পেতে চায়। তাদের ধারণা কেজি স্কুলগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, লেখাপড়ার মানবৃদ্ধিসহ অন্যান্য বিবেচনায় অনেকটাই নির্ভরশীল। আমি জানি না শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব দেশের যে ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তাতে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে কতটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিংবা আদৌ করেছেন কিনা। তবে সরকারের অর্থব্যয়ে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মান এখন এতটাই নিচে অবস্থান করছে যে, এগুলোর মধ্যে এখন আলাদা করার সুযোগ খুবই কমে গেছে।

দেশে এখন ১৫ হাজারের বেশি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাত্র ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি মানুষের আস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়া সত্ত্বেও সরকারি হাইস্কুলের সংখ্যা খুবই সীমিত হওয়ার কারণে বেসরকারি হাইস্কুলের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অধিকাংশ বেসরকারি হাইস্কুলই সরকারি অনুমোদন লাভ করার ফলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ এমপিওভুক্ত হন। দেশে ২০০০-এর অধিক বেসরকারি এবং ২৩৩টি সরকারি কলেজ রয়েছে। ৮০০০-এর অধিক মাদ্রাসাও সরকারের অনুদান পাচ্ছে। বলাবাহুল্য এসব বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা,

www.pathagar.com

অনুমোদন লাভ ও সরকারি অনুদান লাভের কিছু সরকারি নিয়ম-নীতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং শিক্ষা অধিদপ্তরগুলো এতই দুর্নীতিপরায়ণ যে অনেক অস্তিত্বহীন কিংবা নামেমাত্র স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজকেও এরা সরকারি অনুদান পাইয়ে দিয়ে থাকে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি বড়ধরনের মাফিয়া-চক্র দেশে গড়ে উঠেছে। এরা প্রতিবছর সরকারের শত শত কোটি টাকা লোপাট হওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই, অথচ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে শিক্ষক-কর্মচারী আছেন, কিন্তু বাস্তবে তা নেই। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদ স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের হাতে থাকে। ফলে শিক্ষক নিয়োগেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সবকিছুই ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে ম্যানেজ করা হচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, বেশকিছু ভুয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও সন্ধান পাওয়া গেছে—সরকার যদি অনুমোদনকারী কর্মকর্তাদের ফাইল ও কাগজপত্র যাচাই করে দেখার ব্যবস্থা করে তাহলে শিক্ষাবোর্ডসমূহ এবং অধিদপ্তরগুলোর অভ্যন্তরে বিরাজমান দুর্নীতিবাজ চক্রকে চিহ্নিত করা মোটেও দুরূহ কোনো ব্যাপার হবে না। আমাদের ধারণা, অনুমোদন দানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি জবাবদিহিতা যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় তাহলে বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় যেসব অনিয়ম এবং দুর্নীতি চলে আসছে সেগুলো অনেকটা কমে আসবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি; মেধাবী, দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগদান এবং শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক দায়দায়িত্বই সরকারের বহন করা উচিত নয়। যেসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা যথার্থ অর্থেই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দায়িত্ব বহন করবে সেগুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়া, দুর্নীতিমুক্তভাবে কার্যকর করা গেলে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

দেশে প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষার সময় সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। এটি দেশব্যাপী কোনো সময়ই সমানভাবে কার্যকর সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আসলে কেন ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশই পাবলিক পরীক্ষায় নকলের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয় সে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা কতখানি স্পষ্ট জানি না। তবে অধিকাংশ গ্রামীণ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীরা নিচের ক্লাস থেকেই অবহেলা ও অযত্নের মধ্যদিয়ে পড়তে যায়, মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের অধিকাংশেরই নাগালের বাইরে; মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষকের সংস্পর্শে তাদের আসার সৌভাগ্য খুব কমই ঘটে।

www.pathagar.com

বিশেষত ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পাঠ্যপুস্তকগুলোর পাঠসমূহ ভালোভাবে রপ্ত করার মতো অভিজ্ঞ, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের আকাল আক্ষরিক অর্থে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাইভেট টিউটরদের বাড়িতে নিয়মিত পড়তে হচ্ছে। সত্যিকার অর্থেই আমাদের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা এখন শিক্ষকতার পেশায় খুব একটা আসতে আগ্রহী নয়। এগুলোতে আর্থিক সুযোগসুবিধা তেমন নেই, চাকরির মর্যাদাও বিশেষ কিছু নেই। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে অনেক ধরনের খবরদারিত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভাব চলে যা মেনে চলা কোনো মেধাবী ও রুচিশীল শিক্ষকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বস্তুত দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠতে পারেনি ছাত্র-শিক্ষকদের স্বাভাবিক সুস্থ প্রতিভা বিকাশের এক-একটি কেন্দ্রে। মুক্ত আবহ, সুস্থ-স্বাভাবিক শিক্ষার আনন্দ ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ ব্যতীত আধুনিক বিশ্বে কোথাও মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার বিকাশ ঘটেনি, ঘটবেও না। আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান পশ্চাৎপদ, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ব্যতীত তা আশা করা বোধ হয় যাবে না।

৫ নভেম্বর ২০০২, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে উদ্ধৃত করে গত ২২ ডিসেম্বর তারিখ দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকা 'স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক লেটার গ্রেডিংয়ের নতুন বিন্যাস' শিরোনামে একটি শীর্ষ প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। ২০০১ সাল থেকে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফল মাত্র দুবার প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার ফল এই নিয়মে আগামী পরীক্ষা থেকেই মূল্যায়িত হওয়ার কথা ছিল। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে, ২০০৩ সাল থেকে বর্তমান লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংস্কার করে নতুনভাবে বিন্যাসের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। শিগগির প্রচলিত ছয় ধাপের বদলে আটটি ধাপের নতুন বিন্যস্ত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার কথা জানানো হবে বলে পত্রিকাটি জানিয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে খবরটি বেশ তোলপাড় সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকল মহলকেই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে অগ্রসর হতে অনুরোধ করব। কেননা, সনাতন পদ্ধতি এবং ইতোমধ্যে চালুকৃত গ্রেডিং পদ্ধতির কারণে সকল মহলেই রয়েছে বড় ধরনের বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা এবং মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দেশে এখন তেমন কোনো বিতর্ক নেই। সনাতন নম্বর পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক লেটার গ্রেডিং চালু করার পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত রয়েছে এটি নিশ্চিত বলা যায়। ২০০১ সালে এ পদ্ধতি চালু যখন হয় তখন অনেকের কাছেই নতুন এই পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণাগত অস্পষ্টতা ছিল, তাই কিছু বিভ্রান্তি এবং সংশয় ছিল। গত দুবছরে তা অনেকটাই কেটে গেছে। তবে কিছু কিছু ধাপ নিয়ে বিতর্ক এবং দাবিও ছিল সংস্কারের। এ-ধরনের বিতর্ক এবং দাবি উত্থাপনের পেছনে মূল কারণ ছিল মূলত সনাতন নম্বর পদ্ধতিতে (Numerical) করা মূল্যায়নকে লেটার গ্রেডিং-এ ট্রান্সফার করার এবং এ-ধরনের দ্বৈতপদ্ধতির আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে। বলাবাহুল্য, লেটার গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রে এ-ধরনের দ্বৈত পদ্ধতির কোনো প্রয়োজন নেই, নজিরও নেই।

www.pathagar.com

পৃথিবীর যেসব দেশে ক্লাসপরীক্ষা বা সাধারণ পরীক্ষার মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাতে মূলত ৪/৫ ধাপে ছাত্রের উত্তরকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এটি লেটার গ্রেডিং এবং সংক্ষিপ্ত নম্বর গ্রেডিং-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন—কোনো কোনো দেশে ১, ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, এটি উল্টোদিক থেকেও করা হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো লেটার গ্রেডিং-এ A^+, A, B^+, B, C^+, C ইত্যাদি ৪/৫ লেটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রশ্নের উত্তর, তা লিখিত বা মৌখিক যেভাবেই করা হয়ে থাকুক না কেন, কোনোভাবেই তা খুব বেশি ভাগে বা ধাপে বিভক্ত করে দেখা হয় না। আসলে শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই বা উত্তরকে খুব বেশি ভাগে বিভাজন করার প্রয়োজন পড়ে না, সেটি সবক্ষেত্রে নিরূপণ করাও সম্ভব নয়। কয়েকটি বড় মাপের দাগে বা ধাপে শিক্ষার্থীর দেয়া বা লেখা উত্তরকে নির্ধারণ করাই হচ্ছে গ্রেডিং পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

অপরদিকে আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের সনাতন পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরে শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নের সুবিধাটি এখন আর কোনোভাবেই খুব একটা সমর্থন করা যাচ্ছে না। বিশেষত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরদানে মূল্যায়নকারীর মধ্যে এতবেশি তারতম্য ঘটে যে, এর ফলে শিক্ষার্থীরাই নানাভাবে অতিমূল্যায়িত বা অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে। গাণিতিক বা বিজ্ঞানবিষয়ক উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এতে খুব বড়ধরনের হেরফের হয় না। অথচ আমাদের দেশে সাহিত্য তথা রচনামূলক এবং গাণিতিক তথা বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভিন্ন ভিন্ন ধারার প্রবর্তন করে একটি বড়ধরনের সমস্যা জিইয়ে রাখা হয়েছে। যেমন—বাংলা সাহিত্য, ইংরেজি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে নম্বরদানের ক্ষেত্রে যে-নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে; বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা করা হয় না, ভিন্ন নিয়ম অব্যাহত আছে। অথচ পৃথিবীর যেসব দেশে গ্রেডিং পদ্ধতি রয়েছে সেখানে রচনামূলক এবং বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরের মান নির্ণয়ে শিক্ষার্থীগণ গ্রেডিং বা নম্বর প্রাপ্তিতে কোনো তারতম্যের শিকার হয় না। এমনকি অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যার প্রশ্নের উত্তরের যে-অংশ যথার্থ হচ্ছে সে-অংশের জন্যই শিক্ষার্থী নম্বর বা গ্রেড লাভ করে থাকে। যে-অংশের উত্তর ঠিক হচ্ছে না সে-অংশের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ নম্বর বা লেটার-গ্রেড শিক্ষার্থী অনায়াসে লাভ করে থাকে। এর ফলে রচনামূলক এবং বিজ্ঞানবিষয়ক উত্তরপত্রের মূল্যায়নে ঐসব দেশে তেমন কোনো হেরফের হয় না। আমাদের দেশে সর্বোচ্চ ১০০ নম্বরে একজন শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রচনামূলক উত্তরপত্র একভাবে দেখা হয়ে থাকে, এতে একজন শিক্ষার্থী খুব ভালো লিখেও দেখা যাচ্ছে ৮০ শতাংশ নম্বর লাভ করতে কষ্ট হচ্ছে, পরীক্ষকভেদে নম্বরদানে তারতম্য ঘটছে; আবার বিজ্ঞানবিষয়ক উত্তরপত্রের ক্ষেত্রে ৯০ থেকে ১০০ নম্বর লাভের ক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর তেমন কোনো সমস্যা বা ভিন্নতা হয় না। এটি ঘটেছে সনাতন পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরে উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকদের অভ্যস্ত হওয়ার কারণে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে যদি মান বা ধাপ নিরূপণের চিন্তাভাবনা এর সঙ্গে যুক্ত থাকত তাহলে একই পরীক্ষার উত্তরপত্রকে কয়েকটি মান বা ধাপে বিভক্ত করাই লক্ষ্য হিসেবে কাজ করত, যেমনটি গ্রেডিং পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে এতদিন পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীদেরকে ক্রমানুসারে সারিবদ্ধ করা; এজন্য বিশাল ১০০ নম্বরকে বিবেচনায় রেখে নম্বর দেওয়া ও নেওয়ার মাধ্যমে তা অর্জন করা হত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর চাপের কাছে সনাতন এই নিউমেরিক্যাল মূল্যায়ন পদ্ধতি অর্থহীন হয়ে পড়ায় আমরা গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিফট করেছি মাত্র। কিন্তু আমাদের ধ্যানে এখনও ১০০ নম্বর-এর অভ্যস্ততা বিরাজমান। সে-কারণেই ২০০১ সালে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে A গ্রেড নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেনি। কেউ বলেছেন, যে-ছাত্র ৬০ নম্বর পেয়েছে সে এবং যে-ছাত্র ৭৯ নম্বর পেয়েছে সেও A গ্রেড লাভ করেছে। এভাবে নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টিকে দেখার ফলে বিতর্কটি জাতীয়ভাবে আমাদের মাথায় আরো প্রকট হয়ে গেছে। অথচ ১০০ নম্বরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নম্বর প্রাপ্তির যে তারতম্য ঘটে থাকে তা তো কোনোভাবেই নিরসন করা সম্ভব নয়। আমরাই এতদিন একজন শিক্ষার্থী থেকে অন্যজনের উত্তরপত্রকে পৃথক করার জন্য এত বিশাল (১০০) নম্বরকে চূড়ান্ত ধরে পার্থক্যটি নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি। কারণ আমাদের ধারণাতেই একদিন একই নম্বরে দুজন শিক্ষার্থী ছিল না। স্কুলপরীক্ষাতে এটিই এতদিন আমরা অনুসরণ করে এসেছি, এখনও তা করা হচ্ছে।

আমরা আসলে এতদিন শিক্ষার্থীদের নম্বরের ক্রমানুসারে সাজাতে চেয়েছি, তাদের মেধাকেও ১০০ নম্বরের মাধ্যমে একইভাবে সাজাতে চেয়েছি। যে-যুগে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল তখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম ছিল বলেই ১০০ নম্বরকে বেছে নিয়ে তা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আজকের দিনে পুরো এই বিষয়গুলো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতার দিক থেকে বদলে গেছে। মেধার ভিত্তিতে দু-চার পাঁচজনকে আলাদা করা যেতে পারে, কিন্তু এর বেশিসংখ্যক ছাত্র বা মানুষকে আলাদা করার সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। কেননা, একটি ক্লাসে যদি ৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে তাদেরকে মেধার ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখার আসলে গ্রহণযোগ্য যুক্তিসঙ্গত কোনো উপায় নেই, আদৌ এভাবে নম্বরায়ন করা শিক্ষা বিজ্ঞান সমর্থনও করে না। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে প্রথম হয় সে নিজেকে সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এবং মেধাবী ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে, আবার যে বা যারা এর পরে অবস্থান করে তাদের মধ্যে আস্থাহীনতার সংকট তৈরি হতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাপদ্ধতি এভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা

www.pathagar.com

তৈরি করতে বা বহাল রাখতে পারে না। বস্তুত প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মেধার মাপ পরিমাণটি খুবই আপেক্ষিক। মেধাকে নম্বরায়ন করা হলে এর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা হতে পারে। সে-কারণে উন্নত দুনিয়ায় পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট শ্রেণীর বা ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের বা সামগ্রিক জ্ঞানের মানকে বড় মাপে কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করার জন্য লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে ভেদরেখা টানার চেষ্টা করা হয় না, বরং সেটি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্যই গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের এই ধারণাগত স্পষ্টতাতেই আমাদের রয়েছে যথেষ্ট অনভিজ্ঞতা, অস্পষ্টতা। সে-কারণেই এ নিয়ে বিরাজ করছে বেশকিছু বিভ্রান্তি। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ধরনের গ্রেডিং পদ্ধতি। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। আমাদের দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই একাধিক গ্রেডিং পদ্ধতি বিরাজ করছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং পদ্ধতির কোনো মিল নেই। একই দেশের মধ্যে একাধিক গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল মূল্যায়নের বর্তমান বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাটি মোটেও কাম্য নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। বাংলাদেশে একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি সর্বত্র কার্যকর হবে সেটিই প্রত্যাশিত।

প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সম্ভাব্য ৮ ধাপে ফল মূল্যায়নের সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি সত্যিই চূড়ান্ত হলে, কিংবা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নে কার্যকর হলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করছি সবশেষে সে-সম্পর্কে আলোকপাত করছি। নতুনভাবে ৮টি ধাপে বিন্যস্ত-করা ছকটিও নিউমেরিক্যাল বা সংখ্যাগত লেটার গ্রেডিং এবং জিপিএ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, এই নিয়মে উত্তরপত্রে ১০০ নম্বর ধরে মার্কিং করা হবে, এর ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। আসলে আমাদের মন ও মাথা থেকে ১০০ নম্বরের ভূতটি মোটেও যাচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিশাল অঙ্কের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করব ততক্ষণ পর্যন্ত লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য বা চেতনাই কার্যকর হবে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। হ্যাঁ, আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাসকে রাতারাতি বদলানো যাবে না—এমন একটি সমস্যা থেকেই যাচ্ছে; তাছাড়া আমাদের পরীক্ষকগণও এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে গোটা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার প্রশিক্ষণ লাভ করেননি। লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে আমরা তখনই পুরোপুরিভাবে উত্তরণ ঘটাতে পারব যখন গোটা উত্তরপত্রটি ১০০ নম্বরের পরিবর্তে শুধুমাত্র লেটার চিহ্নদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব।

www.pathagar.com

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত ছকটি একটু লক্ষ্য করা যেতে পারে।

নম্বর	লেটার গ্রেড	জিপিএ
৯১-১০০	এ+	৫.০০
৮১-৯০	এ	৪.৫০
৭১-৮০	বি+	৪.০০
৬১-৭০	বি	৩.৫০
৫১-৬০	সি	৩.০০
৪১-৫০	ডি	২.০০
৩৩-৪০	ই	১.০০
০০-৩২	এফ	০০

এই ছকটি দেখলে বোঝা যায় যে, ৪১-এর ঊর্ধ্বে প্রতি ১০ নম্বরের জন্য একটি লেটার গ্রেড এবং .৫০ জিপিএ নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব মারাত্মক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে সে-সম্পর্কে উল্লেখ করছি। ৯১ থেকে ১০০ নম্বর পেলেই একজন ছাত্র A^+ গ্রেড বা ৫.০০ জিপিএ লাভ করবে। প্রশ্নপত্রের ধরন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির সঙ্গে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততার কারণে আমাদের দেশে হাতেগোনা খুবই কমসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পক্ষে A^+ গ্রেড লাভ করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষত রচনামূলক উত্তরপত্রের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাটি খুবই প্রবল। যেসব দেশে গ্রেডিং পদ্ধতি যথার্থ অর্থে কার্যকর আছে সেখানে A^+ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটেও বিরল নয়। প্রস্তাবিত ছকটি কার্যকর হলে A^+ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিরল বললেও কম বলা হবে বলে আশঙ্কা করছি। কেননা, গত দুবছর এসএসসি পরীক্ষায় যেসব ছাত্র-ছাত্রী A^+ গ্রেড লাভ করেছে তাদেরকে সকল বিষয়ে শতকরা ৮০ নম্বরের ওপরে পেতে হয়েছে। রচনামূলক পত্রের মূল্যায়নে সনাতন ধ্যানধারণার পরিবর্তন না-করার পরও যেসব ছাত্রছাত্রী বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস-এর মতো বিষয়ে ৮০-এর অধিক নম্বর লাভ করেছে তারা নিঃসন্দেহেই মেধাবী। এই পরিসীমাটি ৮০ থেকে ৯০ ধরা হলে A^+ গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা আদৌ থাকবে কিনা বলা মুশকিল। উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরকে কার্যকর রাখার পদ্ধতি যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন অন্তত রচনামূলকপত্রে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে A^+ গ্রেড পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়েই থাকবে।

আমি মনে করি নীতি-নির্ধারকদের নম্বরায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব এসব সমস্যা সম্পর্কে আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাবতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ৯০%-এর ঊর্ধ্বে প্রাপ্ত নম্বরকে A^+ গ্রেডভুক্ত করার চিন্তা বাংলাদেশে আদৌ সুচিন্তা হতে পারে না, কিংবা নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ঐ গ্রেডিং পদ্ধতিকে

www.pathagar.com

অনুসরণ করা হচ্ছে বলে তা বাংলাদেশের মস্তবড় পাবলিক পরীক্ষাতেও প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত বা বাস্তবসম্মত হবে না। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা যে-পদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব; দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত কোনো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর উত্তরপত্র মূল্যায়নে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ, প্রশিক্ষণবিহীন হাজার হাজার শিক্ষক দ্বারা তা কার্যকর করা মোটেও সুচিন্তিত হতে পারে না।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা, হালকাভাবে নেওয়া কর্তৃপক্ষের মোটেও উচিত হবে না। এমনিতেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নানাধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, দায়িত্বহীনতা, জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি কারণে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়, মেধার স্বীকৃতি পায় না, সমস্যায় পড়ে, প্রকৃত মেধা নিয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে না। এর ফলে তাদের শিক্ষাজীবনে সৃষ্টি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা তথা ফলাফল বিপর্যয়। তার ওপর নতুনভাবে প্রবর্তিত কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। সেসব দিক বিবেচনা করে গ্রেডপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে গত দু-বছরের নিয়মটি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। প্রস্তাবিত ছকে A, B^+ এবং B গ্রেডের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ নম্বর প্রাপ্তির বিধান রাখা হয়েছে তা ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহী না করে হতাশ করতেই শেষপর্যন্ত ভূমিকা রাখবে বলে আমার আশঙ্কা। আমার অনুমান, প্রস্তাবিত ৮ ধাপের গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হলে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা A^+ থেকে বঞ্চিত হবে বেশি (উন্নত দুনিয়ায় এদের A^+ গ্রেড পেতে খুব বেশি সমস্যা হবে না—অথচ দেশে সমস্যা তৈরি করা হয়েছে বলা যাবে), এর নিচে এসে অন্তত তিনটি গ্রেডে তারা গড়াগড়ি খাবে, বিভাজিত হবে, শেষপর্যন্ত দেশের লেখাপড়াও পরীক্ষাপদ্ধতির ওপর তার বীতশ্রদ্ধ হতে পারে।

আসলে গ্রেডিং পদ্ধতির ধারণাগত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সম্যকভাবে অবহিত হয়ে পুরোপুরি সেই পদ্ধতিতে চলে যাওয়ার উপায় এবং করণীয়ই নির্ধারণ করতে হবে। তবেই এতসব জটিলতা ও অনাবশ্যক ধাপ-উপধাপে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলকে বিভক্ত করার প্রয়োজন পড়বে না, সেটি কাম্যও নয়। একটি অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকর করার উপায় উদ্ভাবন করার বিষয়টিও একইসঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ করব।

দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে' লাঠিয়াল-পাহারাদার বাহিনী!

ছোটকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে ডাকতে শুনে এসেছি। কেন অক্সফোর্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত, অক্সফোর্ডের কোন্ কোন্ দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করেছে, কিংবা ছাত্র-শিক্ষক অথবা এ-অঞ্চলের মানুষ তাতে কী কী খুঁজে পেয়েছে—ওই ধরনের কোনো প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজে পেয়েছে কিনা জানি না। তবে স্বীকার করতেই হবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর বেশ কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ, লেখাপড়া, গবেষণা এবং থাকা-খাওয়ার জন্য ছিল ঈর্ষণীয়। এর মধ্যে আভিজাত্যের যে লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেত তা অনেককেই হয়তো মনে করিয়ে দিত অক্সফোর্ডের কথা। প্রায় নয়শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত অক্সফোর্ডের সঙ্গে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়ে বলা মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হলেও কেউ একে দণ্ডনীয় বা দোষের কিছু মনে করতেন না এ-কারণেই যে, এখানে যারা পড়াতে এসেছিলেন, পড়তে এসেছিলেন তাদের অনেকেই মেধা, গবেষণা, শিক্ষাদীক্ষায় তৎকালীন ভারতবর্ষের বেশ নামীদামি ও সুপরিচিত ছিলেন। সম্ভাবনার দিক থেকে তাই কেউ কেউ এটিকে তখন হয়তো এ-অঞ্চলের অক্সফোর্ড বলে ভাবতেন। এই ভাবাভাবির মধ্যে দোষের কিছু ছিল না বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে-ধারণা ও আশাবাদ গড়ে উঠেছিল তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। একথা তো স্বীকার করতেই হবে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তের বিকাশ, শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াসহ আমাদের অর্জনের অনেকটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই ঘটেছে কিংবা সম্ভব হয়েছে। বিশেষত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের অনেকটাই সম্ভব হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনে সবক্ষেত্রেই অক্সফোর্ডের মতো প্রভাব ফেলেছিল, ভূমিকা রেখেছিল। অতএব এখানকার মধ্যবিত্তরা একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যে অহংকার করেছিল তাতে খুব বেশি দোষ দেওয়ার কিছু দেখি না।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাপক যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে না-থাকায় এর বহুমাত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা-উত্তর নানা উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে এখন যে-জায়গায়

www.pathagar.com

এসে দাঁড়িয়েছে বা সম্মুখের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে তাতে আশার আলোর সন্ধান পাওয়া বেশ দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সে-ধরনের বিস্তৃত আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উচ্চবিত্তরা এখন মোটেও ভাবিত নয়, তাদের বড় অংশই তা থেকে সরে আসতে শুরু করেছেন। তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এমনকি মধ্যবিত্তেরও একটা অংশ যারা জীবন-জীবিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে চান তারাও সরতে চেষ্টা করছেন। কেন? এ-ধরনের প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে অনেকেই পেতে শুরু করেছেন।

আসলে ঢাকাসহ দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এখন লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চার বিষয়-আশয়গুলো এতই গৌণ ও দুর্বল হয়ে উঠেছে যে, যাদের যথেষ্ট বিত্ত আছে তাদের বেশির ভাগই এখন এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে সবকালেই মুক্তবুদ্ধিচর্চার কেন্দ্রবিন্দু বলা হত। বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কি মুক্তবুদ্ধির চর্চা অবাধে হচ্ছে? নামমাত্র যে লেখাপড়া হয়, তা থেকে আলোকিত মানুষ তৈরির সুযোগ কোথায়? পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে-তোলার গভীর জ্ঞানতত্ত্বীয় চর্চা ও ধারণার অস্তিত্ব কোথায়? গত তিনদশকে এক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা ঘটেছে অবিশ্বাস্য রকমের। সেই স্থান পূরণ করেছে দলীয় রাজনীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় ও প্রত্যক্ষ মদদে সাম্প্রদায়িকতা, রক্ষণশীলতা, আঞ্চলিকতা, বিজ্ঞানবিরোধী চেতনা, প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট ধারণা ইত্যাদি প্রবণতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু দেশের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, তাই উদীয়মান মধ্যবিত্তের একটি অংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করে আসছে। রাজনৈতিকভাবে এই সুযোগলাভের বিষয়টি যেহেতু অবারিত হয়েছে, তাই রাজনৈতিক দলের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ওই শক্তি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে বছরের-পর-বছর। যে দলের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার সম্ভাবনা যতবশি সৃষ্টি হয়েছে সেই দলের ছত্রছায়ায় উঠতি তরুণসমাজের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ততবশি সুযোগ গ্রহণ করেছে। এখন ঢাকাসহ সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যে কটি ছাত্রসংগঠন দখলে নিচ্ছে তার পেছনে মোটামুটিভাবে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা ও বিত্তলাভের বিবেচনাই মুখ্য থাকে; এর সঙ্গে লেখাপড়ার চিন্তা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, আলোকিত মানুষ হওয়ার ধারণা, দেশের উন্নতি-অগ্রগতির বিষয়-আশয় খোঁজা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। দেশ ও জাতির শুভচিন্তার বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে এখন তেমন সবল নয়, যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপিতও নয়। জাতীয় জীবনে যেভাবে মিথ্যাচারের প্রসার ঘটছে তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটেও মুক্ত নয়। এগুলোর সর্বত্র এখন শক্তি, দলবাজি, দুর্নীতি ও বিত্তের দাপট

www.pathagar.com

চলছে। জ্ঞানচর্চার জটিল ও গভীর বিষয়গুলো গৌণ হয়ে পড়েছে। চাওয়া ও পাওয়ার এক দুর্নিবার চক্র এগুলোতে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। অনেকেই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে, বই-পুস্তক বন্ধ রেখে ছুটছেন চাওয়া-পাওয়ার পেছনে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাই জ্ঞানচর্চায় নিষ্প্রভ হয়ে উঠছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ থেকে আলাদা হতে পারেনি, মুক্ত থাকতে পারেনি। এর ফলে প্রায়ই ঘটে এমন সব কর্মকাণ্ড যা দেশের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি কমশিক্ষিত মানুষের সাধারণ বিবেককেও নাড়া দেয়, প্রশ্নবিদ্ধ করে। গত বছর যখন শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী-পেটানোর ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে তখন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনেক অতিসাধারণ মানুষও ভাবতে পারেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটতে পারে! বর্বর সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? তাহলে কী শিক্ষা দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? ওই ঘটনার মূল নায়ক-নায়িকারা তো বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র-শিক্ষক বলে জানতে পেরেছিল দেশের সাধারণ মানুষ। ওই ধরনের ঘটনা যারা ঘটাতে পারে, সমর্থন করতে পারে, ওইসব ঘটনায় যাদের মনে কোনো রেখাপাত করে না তারা আর যাই হোক, নিশ্চয়ই 'অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিক্ষালাভ করেনি—এটি অন্তত বলা যায়। তা হলে অক্সফোর্ডে এমন ঘটনা সচরাচরই ঘটত। না, আমরা এ-পর্যন্ত সুদূর অক্সফোর্ডে ঐ-ধরনের নক্কারজনক কোনো ঘটনা ঘটার খবর পাইনি। আজকের দুনিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের যুগে ঐ ধরনের কোনো ঘটনার খবর আমরা না-জেনে থাকতে পারতাম না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে একবছর আগে ছাত্রীদের পেটানোর যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে যা-কিছু ঘটেছিল তার কোনোটিই দেশে-বিদেশে অজানা থাকেনি, তাতে দেশের ভাবমূর্তি বাড়েনি—একথা হর্তাকর্তারা জানেন কিনা জানি না। কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো শিক্ষা আমরা দেখতে পাইনি যে তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল।

এবার ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রিকে প্রফেশনাল ডিগ্রির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব প্রথমেই উপলব্ধির চেষ্টা করলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো অসাধারণ আন্দোলনে যেতে হত না। ওই-যে বলেছিলাম এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চেয়ে শক্তি ও দাপটের চর্চা বেশি হয়—প্রশাসন প্রকারান্তরে তাই করলেন। ফলে ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় নামতে হল, ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিতে হল। কর্তৃপক্ষ যদি এমন সুযোগ করে দেয়, তাতে যদি দোষ না হয়ে থাকে, তাহলে ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রীদের অপরাধ কিসে? ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ডাকা সর্বাত্মক ধর্মঘটকে ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, প্রগতিশীল ছাত্রজোটসহ বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন সমর্থন করায় 'অপরাধ' হিসেবে নিয়েছে সরকার-সমর্থিত ছাত্রদল! ছাত্রদলের

www.pathagar.com

নেতাকর্মীরা রড, লাঠি, চাপাতি, হকিস্টিক নিয়ে হামলা করে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মিছিলে। এর আগে রাতে ৩টি হল থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মারধোর করে বের করে দেওয়া হল। ঢাবির প্রকৃত কর্তৃপক্ষ তাদেরই বলতে হবে! তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা থাকছে!

বিশ্ববিদ্যালয় আর কাকে বলে? বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ও সাধারণ কর্মকাণ্ডের কোনো পাঠ্যসূচিতে এসব পড়ে কিনা জানি না। তবে বাংলাদেশে এদের আমদানি তো হাওয়া থেকে আসেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের 'রাজত্ব' অনেক আগেই কায়েম হয়ে আছে। সুতরাং, এখানে এখন একদল, পাঁচবছর আগে অন্যদল, পাঁচবছর পর অন্যদল—এভাবেই রড, লাঠি, চাপাতি, হকিস্টিক, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কারো-না-কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার 'অধিকার' রাখে, 'সুযোগ' রাখে! বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদীক্ষার চর্চা না হলে ওইসব যন্ত্রপাতির 'চর্চা' তো হবেই!

ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়েছে। ক্লাস হচ্ছে না, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিচ্ছে না, বারবার তারিখ পরিবর্তনের ঘোষণা দিচ্ছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বিভিন্ন পয়েন্টে পাহারা বসিয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মীকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, দেখলে পেটানো হচ্ছে, হামলা ও আক্রমণ হচ্ছে।

'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ ও পাহারাদারের এমন দায়িত্ব ছাত্রদল গ্রহণ করল কোন্ আইনে, কোন্ নৈতিক বলে—সে-প্রশ্ন প্রসঙ্গক্রমে ওঠা স্বাভাবিকই ছিল। অথচ দেশে সরকার আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী প্রশাসন আছে—কেউ আইন বা নৈতিকতার এই দিকটিকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না। একটি ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা অন্য ছাত্রসংগঠনের মিছিলে হামলা করল, পত্রপত্রিকায় হামলার দৃশ্য সম্বলিত ছবি ছাপা হল, টেলিভিশনে দৃশ্য দেখানো হল—অথচ হামলাকারীদের কাউকে ধরার কোনো লক্ষণ নেই। যাদের পেটানো হল তাদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, পেটানো হচ্ছে—এসব কর্মকাণ্ডকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের স্বাভাবিক নীতি-নিয়মের বিষয় বলে ভাবা যায় কি? লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে কি? অন্যের গায়ে হাত দেওয়ার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগের পাঠ্যবিষয় হতে পারে কি? এককথায় এগুলোর উত্তর নাই, বলেই সবাই বলবেন। কিন্তু তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই লাঠিয়াল, পাহারাদার ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর অবাধে বিচরণ ও 'রাজত্ব' প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তো এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর উচ্ছেদ না-ঘটানো গেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণায় পরিচালিত করা না-গেলে এটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের পরিবর্তে, প্রাচ্যের দুর্বৃত্তের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সেদিকেই মনে হয় যাচ্ছি।

ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

ঢাবি, বুয়েট ও দেশের উচ্চশিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ১০ সেপ্টেম্বর ভৈরবে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বলেছেন, "আওয়ামী লীগের হাতে কোনো ইস্যু নেই। তারা ষড়যন্ত্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেছে। বুয়েটও তাদের জন্য বন্ধ হয়েছে। একের-পর-এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ষড়যন্ত্র করে তারা বন্ধ করছে। তারা চায় না এদেশের মানুষ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট বন্ধ হওয়ার পর সরকার-প্রধানের মুখ থেকে শোনা কথায় জানা গেল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট বন্ধের পেছনে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র ছিল এবং তারাই ষড়যন্ত্র করে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটের ঘটনাবলি সম্পর্কে এতদিন পত্রপত্রিকায় যেসব কথা লেখা হয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে, তাতে আওয়ামী লীগের নামধাম ছাপা হয়েছে বলে দেখিনি, বরং উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই এই প্রথম সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদে কিছু কর্মসূচি পালন করেছে। ছাত্রসংগঠনগুলো ওইসব কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত ছিল এমনটি জানা যায়নি। সুতরাং এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,বুয়েট তথা দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে গভীর শঙ্কা জাগাই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে ১৯৯০-এর এরশাদবিরোধী আন্দোলনের পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্বে কোনো আন্দোলনই আর সংগঠিত হয়নি। ছাত্রসংগঠনগুলো দলীয় বৃত্তে এমনিভাবে বাঁধা পড়েছে যে, সংগঠনগুলো জাতীয় কোনো ইস্যুতে এখন আর ঐকমত্য পোষণ করতে পারছে না। ক্ষমতায় থাকা ও যাওয়ার সমীকরণের রাজনীতি ছাত্রসংগঠনগুলোকে জাতীয় জীবনের যে-কোনো সমস্যা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ছাত্রসংগঠনগুলোর দিক থেকে। প্রধান তিনটি ছাত্রসংগঠন (ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির) এখন কার্যত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রাবাস দখল, প্রশাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার কাজে নিয়োজিত। ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্যাও এখন আর প্রাধান্য পাচ্ছে না। তাছাড়া ছাত্রাবাসগুলো দখল করে

www.pathagar.com

ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাতে যে শাসনব্যবস্থা চালু রাখছে তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন শিক্ষাজীবন, ছাত্রাবাস-জীবন উবে গেছে; এক পরাধীন বন্দিজীবনে আবদ্ধ হচ্ছে। দলীয় নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি, মস্তানি, ফাও খাওয়া ইত্যাদি বিষয় এতই প্রকাশ্য হয়ে গেছে যে, কোনো মেধাবী, সৎ, সুস্থ, বিবেকবান ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই ওই-ধরনের ছাত্রছাত্রীদের 'নেতা' বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এসব কারণে গত একযুগ ধরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংগঠনগুলোর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা যতবেশি তীব্র হয়েছে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ততবেশি সংগঠনবিমুখ হয়েছে। এ অবস্থাটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতেই কথা উঠেছে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার। এর পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলা হলেও ওই-ধরনের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার নামে দৃশ্যমান ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন জোরালোই আছে। ছাত্ররাজনীতির অতীত ঐতিহ্য অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে সাম্প্রতিক বছরের তাদের কর্মকাণ্ড।

তবে বলতেই হবে, ছাত্রসংগঠনগুলোর দলমুখিনতা ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিমুখিনতা একদিকে সংগঠনগুলোকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও নানা সমস্যায় জর্জরিত করেছে। সে-কারণেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীগণ ছাত্রসংগঠনগুলোর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ছাত্রসংগঠনগুলোও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এসব অনুভূতিকে বিবেচনায় আনছে না। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদেরকে প্রভু হিসেবে দেখছে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এবং সরকারের কোনো এক কর্তাব্যক্তির (বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা কর্তার কথা বলা হচ্ছে) স্বেচ্ছাচারিতার ফলে যা ঘটে গেল তা গোটা জাতিকেই হতবাক করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসংগঠনগুলোর আগেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। তাদের কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, যুক্তি এবং সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। সে-কারণেই অরাজনৈতিক ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলন দ্রুত সারাদেশে সহানুভূতি লাভ করেছিল। ছাত্রসংগঠনগুলো এ-ধরনের আন্দোলনে এতখানি স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে পারত কিনা সন্দেহ রয়েছে। আমরা যতটুকু জেনেছি পত্রপত্রিকা পড়ে তাতে মনে হয়নি দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রছাত্রীদের কোনো বৈঠক হয়েছে কিংবা তাদের পরামর্শ মোতাবেক ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিল।

আসলে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে গঠিত নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। সে-কারণেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উক্ত আন্দোলনের কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হয়েছিল। কোনো ছাত্রসংগঠন ওই আন্দোলনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব প্রদান করলে অধিকাংশ

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীই তা থেকে সরে দাঁড়াত বলে আমার বিশ্বাস। সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে দূরত্ব ও আস্থাহীনতা নিয়েই চলছে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠন ও ছাত্রছাত্রীরা।

একইভাবে বুয়েটের বিষয়টিও আমাদের বিশেষভাবে দেখার মতো। এখানে সনি-হত্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন ঘটনা নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিয়েছে, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অনশনের মতো নিজেদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রতিবাদী নিরীহ কর্মসূচি দিয়েছিল। এর সঙ্গে সরাসরি ছাত্রসংগঠনগুলোর যুক্ত হওয়ার কোনো আলামত আমাদের জানা নেই। বুয়েট ছাত্রসংগঠনগুলো দূর থেকে ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। পত্রিকায় দেখেছি, সরকারের একজন প্রভাবশালী প্রতিমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগও নিয়েছিলেন, তার উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনার কথাও লেখা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই উদ্যোগ ভেঙে গেল ভেতরের কী কী ঘটনায় তা আমরা দূর থেকে জানি না। তবে অনশনকারী ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের দ্বারা মারধোর করা, তাড়িয়ে দেওয়ার অমানবিক বিষয়টি আবার জাতিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

বুয়েট আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি শহীদ মিনার চত্বরেও কঠোর পুলিশি বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে; কাউকে কোনো মিছিল, সমাবেশ, প্রতিবাদ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, সরকার আদমজির মতোই বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে; সেভাবেই বুয়েট ও ঢাবির শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে। আমরা জানি না এভাবে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে কিনা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন বলে একটি আইন দেশে এখনো চালু আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই আইনের সুবিধা ভোগ করে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও উক্ত আইনের সুবিধা কমবেশি ভোগ করে থাকে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে পুলিশ-বিডিআর বসিয়ে, ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারদের পাহারা বসিয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। যেহেতু দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাগুলো রাজনৈতিক নয়, তাই এর সঙ্গে সরকার বা কোনো রাজনৈতিক দলের না-জড়ানোই উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমঝোতায় আসতে পারবে না, তা আমার বিশ্বাস হয় না। কেননা সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, কোনো সংগঠনের নেতা হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তারা সংগঠনেই যুক্ত থাকত। তাদের অনেকেরই শিক্ষাজীবন, ব্যক্তিগত সততা, আচার-আচরণ ছাত্রসংগঠনের অনেক নেতার চাইতেই ভালো, উজ্জ্বল। এসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আলোচনায় তেমন বড়ধরনের কোনো সমস্যা হতে পারে বলে আমি

www.pathagar.com

মনে করি না। কেননা এরা মূলত অরাজনৈতিক ছাত্র—ভদ্রতা-নম্রতা এরা এখনো ত্যাগ করেনি। শিক্ষকদের অশ্রদ্ধা করা, নিজেদেরকে নেতা বলে ভাবতে শেখেনি। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বর্তমান সমস্যার সমাধানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই সবচেয়ে সফল হবেন, একজন শিক্ষক হিসেবে এটিই আমার বিশ্বাস।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও কিন্তু তেমন ভালো নয়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে আছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মী এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রশিবিরের হামলার মুখে রয়েছে বলেই সবাই জানেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে 'একদলীয় নিরাপত্তা'। এর কোনোটিই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা অনুকূল নয়।

কলেজগুলোর অবস্থা কতটা শোচনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলেজের উপাধ্যক্ষ কে হবেন না হবেন, ভর্তি কারা হবেন না হবেন, কোন্ শিক্ষক কোন্ আদর্শে বিশ্বাস করেন তা যদি কোনো ছাত্রসংগঠনের দেখার বিষয় হয় তাহলে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু থাকবে কীভাবে জানি না। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজে শিক্ষাবহির্ভূত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন হাঙ্গামায় সরকারসমর্থক ছাত্রসংগঠনই জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন ছাত্রসংগঠনগুলো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও কলেজগুলোতে সরকারসমর্থক কিংবা প্রশাসনের সমর্থনপুষ্ট ছাত্রসংগঠনের কর্তৃত্ব, দখলদারিত্ব বেশ শক্তভাবে কার্যকর হচ্ছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের কলেজজীবন নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ছাত্রসংগঠনগুলোর হাঙ্গামায় বেশকিছু কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, লেখাপড়াও তেমন ভালোভাবে হচ্ছে না। এরই মধ্যে সিলেট এমএম কলেজে ছাত্রদলের একজন সমর্থক বা কর্মীকে হত্যা করেছে ছাত্রশিবিরের কয়েকজন ক্যাডার। এ নিয়ে সিলেটে ঘটে গেছে বেশকিছু ভাঙচুর, উত্তেজনা। বন্ধ হয়ে গেছে এমএম কলেজ এবং এমসি কলেজও।

আসলে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে দোষারোপ না করে, প্রভাব বিস্তার করার কোনোরূপ চেষ্টা না করে ছাত্র-শিক্ষকদের সততা, মেধা ও যোগ্যতার ওপর আস্থা রেখে যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেয় তাহলে দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অচিরেই শিক্ষাবিবর্জিত, মেধাশূন্য, আদর্শহীন, মস্তান ও ক্যাডারে ভরপুর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এগুলোতে পুলিশ-বিডিআরের পাহারা বসিয়ে লাভ হবে কি? শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টিকে রাজনীতি ও দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বিবেচনা করতে হবে। তবেই দেশে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকঠাকমতো চলবে। আপাতত সেগুলো মোটেও ভালো চলছে না। এই সত্যটি মানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে।

www.pathagar.com

বিশ্বের শীর্ষ পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের ঠাঁই নেই কেন?

গত ৩ নভেম্বর (২০০৫) তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা দেখা বা পড়ার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, বাংলাদেশ সম্পর্কে আর একটি দুর্ভাগ্যের খবর তাদের পড়ার দুর্ভাগ্যই হয়েছে বলা যেতে পারে। ঐদিন *ইত্তেফাক* পত্রিকার শীর্ষ প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল : "বিশ্বের শীর্ষ পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের ঠাঁই নেই"। শিরোনামটির সঙ্গে আক্ষেপের একটি সুর জড়িয়ে আছে এতে সন্দেহ নেই । তার ওপর বড় অক্ষরে লাল কালিতে যখন পত্রিকার একেবারে উপরে কিছু একটা লেখা থাকে, তখন পাঠকের দৃষ্টিতে তা না-পড়ে উপায় থাকে না। ঐদিন সকালবেলা একটি টিভি-চ্যানেলে প্রচারিত 'আজকের সংবাদপত্র'র আলোচনায় পত্রিকার মূল শিরোনামের দৃশ্য দেখেই ঘর থেকে বের হয়ে হকারের কাছ থেকে ইত্তেফাকটি কিনে এনে পড়লাম। ধরে নিচ্ছি ইত্তেফাক পত্রিকা এবং টিভি-চ্যানেলগুলোতে উপস্থাপনার কারণে ঐদিন দেশ-বিদেশের অসংখ্য বাঙালি পাঠক-শ্রোতা-দর্শক প্রতিবেদনটি দেখেছেন। আমার ধারণা যারা শুধু টিভি-চ্যানেলগুলোর পর্দায় ইত্তেফাক পত্রিকার ঐটুকু শিরোনাম দেখেছেন তাদেরও অনুভূতি-প্রতিক্রিয়া খুব একটা সুখের ছিল না। যদিও ঈদের আমেজ, উচ্ছ্বাস ও উৎসব নিয়ে মানুষের ব্যস্ততা বেশিই ছিল, তথাপি মেধা, মনন ও মানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোথাও আমাদের ঠাঁই হচ্ছে না—এমন সংবাদ যখন গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয় তখন লজ্জা এবং দুঃখ বলে তো কিছু-না-কিছু আমাদেরকে গ্রাস করেই থাকে। যদি তা না করে তবে বলতে হবে আমরা একবিংশ শতাব্দীর সংবেদনশীল মানুষরূপে গড়ে ওঠার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছি।

ইত্তেফাকে ঐদিন প্রকাশিত প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন ইত্তেফাকের সাংবাদিক সাহাবুল হক। তিনি চীনের সাংহাই জিয়াংটাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দি ইন্সটিটিউট অব হায়ার এডুকেশন' কর্তৃক ইন্টারনেটে পরিবেশিত তথ্য নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বিশ্বের মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়ের তারতম্য নিরূপণের জন্যই এ-ধরনের একটি র‍্যাংকিং করা হয়েছে। মূলত শিক্ষার গুণগত মান, ফ্যাকাল্টি মান, গবেষণাকর্ম ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আকার, এলামনাই, গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি অথবা

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ, মৌলিক গবেষণা ও জার্নাল প্রকাশ ইত্যাদি অপরিহার্য বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়েই তৈরি-করা তালিকায় উক্ত ইন্সটিটিউটটি বিশ্বের সেরা পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইন্টারনেটে ছেড়েছে। সেই তালিকায় আমাদের প্রতিবেশী ভারতের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রয়েছে, বাংলাদেশের একটিরও নাম না-দেখে হয়তো প্রতিবেদক মনে কষ্ট পেয়েছেন। সে-কারণেই তার প্রতিবেদনের শিরোনামটিতে 'ঠাঁই'-এর মতো শব্দ স্থান পেয়েছে।

দুঃখ পাওয়ার কথাই বটে। দীর্ঘকাল থেকেই সবাই দেশের কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের আগে পাশ্চাত্যের ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড ইত্যাদি বিশেষণের কথা শুনে আসছেন, এককালের দুর্লভ পি-এইচ.ডি. ডিগ্রিরও এখন ছড়াছড়ি দেখছেন, প্রফেসর পদের শিক্ষকের সংখ্যাও এখন অনেক দেখছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষক এখন ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সর্বোচ্চ প্রফেসর পদে আসীন হচ্ছেনই। ইউরোপের কোনো বড় দেশের ৮/১০টি নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বাংলাদেশের ঢাকা বা ৩০/৪০ বছরের যে-কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের সংখ্যা হয়তো বেশিই হবেন। আমি থাইল্যান্ডের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানি যেখানে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন যিনি প্রফেসর পদটি অলংকৃত করতে পেরেছেন, বাংলাদেশে এখন এমনটি কল্পনাই করা যায় না। দেশের কলেজ-প্রফেসরদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-করেও দেখতে পাচ্ছি যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপকের সংখ্যা যখন আমাদের ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে দেশের মানুষের পক্ষে বোঝার উপায় নেই—কেন আমরা পারছি না, অন্যরা পারছে, আমাদের সমস্যাটি কোথায়? আমাদের অভাব বা ঘাটতি কোথায়?

বলে রাখি, এ-ধরনের আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় নেই। আমাদের কোনো স্তরেই শিক্ষার মান নেই। কারণ, যে-কোনো পণ্যের যেমন তৈরির পরিকল্পনা, উপকরণ, ব্যবস্থাপনাসহ অনেককিছুর প্রয়োজন রয়েছে, শিক্ষার বিষয়টিও একইভাবেই বিবেচনার দাবি রাখে। আমাদের এখনো পর্যন্ত অনুসরণ করার মতো একটি জাতীয় শিক্ষানীতিও নেই। শিক্ষাবিরোধী শক্তিরা গত ৩৫ বছর ধরে একটি মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জাতিকে শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে দেয়নি, পদে পদে বাধা দিয়েছে, শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনগণকে অপপ্রচার ও ভুল ধারণা দিয়েছে। ফলে ৩৫ বছর ধরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চলেছে কোনো ধরনের শিক্ষানীতিবিহীনভাবে। এর ফলে যত্রতত্র নামসর্বস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (কেজি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, ভোকেশনাল ইত্যাদি) গড়ে উঠলেও এগুলোর কোনো স্তরেই মানসম্মত শিক্ষাক্রম চালু করা যায়নি। একই স্তরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঠদান, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাক্রম

www.pathagar.com

ও পরিবেশসহ সবকিছুতেই বৈষম্য ও তারতম্য ঘটে চলছে। ফলে ভালো-খারাপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধারণা ব্যাপকভাবে তৈরি হয়েছে।

এখন ভালো স্কুল, ভালো কলেজ, ভালো বিশ্ববিদ্যালয়-এর ধারণাও কিন্তু স্পষ্ট নয়। কেন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো, কেন অন্যগুলো তা নয় তা কেউ সুনির্দিষ্ট করতে পারছেন না। খারাপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে কোন্‌গুলোকে বোঝাব? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানসম্মত না হলে সেগুলোকে মানসম্মত করা যাচ্ছে না কেন; সে-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টিকে থাকার আইনগত, আর্থিক, নৈতিক বা অন্যান্য ভিত্তি কিসের—এসব হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন এখন আমরা হচ্ছি। আমরা এখনো বলতে পারছি না যে, আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্টির সামান্যতম সুযোগ আছে কিনা। যদি থাকত তাহলে বিত্তবান অভিভাবকগণ অঢেল অর্থ খরচ করে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠাতেন না পড়াতে। যাদের পর্যাপ্ত বিত্ত নেই, খরচ জোগানোর মতো পয়সা নেই—তারা নিরুপায় হয়ে ছেলেমেয়েদের দেশের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই এখন এমন চরম আস্থাহীনতায় পড়েছে। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থার কোনো স্তরেই ছাত্রদের দক্ষ,বিশেষজ্ঞ ও জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার মতো দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না, করা যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে হবে তেমন ভরসার ভিত্তিও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

গোটা শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা বাদ রেখে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা বলতে চাই। দেশে এ-মুহূর্তে ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রায় ১৮০টির মতো বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ রয়েছে। ৫ থেকে ৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এসব বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে অধ্যয়ন করছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কতজন শিক্ষক এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত আছেন, তার কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই সত্য, তবে সংখ্যায় এটি ১০ থেকে ১২ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছুটা বেশিও হতে পারে। মনে হচ্ছে সকলের অজান্তেই দেশে উচ্চশিক্ষার নামে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা সংখ্যার বিচারে খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া সংখ্যাটি এখানে মুখ্য বিবেচ্য নয়। তারপরও প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকের পরিসংখ্যানকে কম বলা যাবে না। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছে দেশে উচ্চশিক্ষার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও পরিকল্পনা ছাড়া।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে তোলার পেছনে আঞ্চলিক সন্তুষ্টি বিধান যখন কাজ করে তখন বিশ্ববিদ্যালয়-চেতনা ব্যাহত হতে বাধ্য। বাংলাদেশে এটি ঘটেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ফলে অধিকাংশ আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক শিক্ষার দর্শন নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতিসহ গোটা প্রশাসনে আঞ্চলিকতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সাম্প্রদায়িকতা গোড়াতেই প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থবরাদ্দে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

www.pathagar.com

কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, গবেষণার সুযোগসুবিধা তিরোহিত হয়েছে প্রথম থেকেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজের মতোই প্রচলিত কিছু পাঠদানের প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে মাত্র। এগুলোর প্রশাসন, শিক্ষাক্রমের চিন্তাভাবনাতেও পাঠদান, পরীক্ষা নেওয়া, এবং ফলপ্রকাশের কতগুলো গতানুগতিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চলতে দেখা যায়। সে-কারণে এগুলোকে আদৌ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে।

দেশের প্রায় ১৭০-১৮০টি কলেজকে কোন্ চিন্তা থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ' নামকরণ করা হয়েছে জানি না। সেগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স পড়ানোর চিন্তাটি কতখানি স্থূল ও অপরিকল্পিত তা ভাবতেই আশ্চর্য হতে হয়। অথচ দেশের সিংহভাগ ছাত্রছাত্রী ঐসব 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' থেকে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি নিচ্ছে। অনার্স ও মাস্টার্সের বিদ্যা তাদেরকে কতখানি দেয়া যাচ্ছে তা কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখছে না।

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খেলার হিড়িক পড়ে গেছে। বিদ্যায়তনিক দিক থেকে এগুলোকে কেজি স্কুলের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা দারুণভাবে করা হচ্ছে। এর বাইরে এখন আর যেন করার কিছু নেই। কেননা, স্বীকৃতি প্রদানের সময়ই তো মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি, পরবর্তী সময়ে ব্যবসা ও রাজনীতি একজোট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাকেই হটিয়ে দিচ্ছে ছোট ক্যাম্পাস থেকে।

আসলে আমরা উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা বলতে কী বুঝব, বোঝাব, কী অর্জন করব—তাতেই আমাদের মস্তবড় গলদ রয়েছে বলে আমার সবসময় মনে হয়। দেশের উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা, উপযোগিতা, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা ও আয়োজনসমূহ ভালোভাবে যদি দেখি তাহলে বলতে হবে এগুলো স্রেফ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রির কিছু সার্টিফিকেট প্রদানের কাজই শুধু করে থাকে। কিছুটা তারতম্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে সত্য, বেসরকারিগুলো বাণিজ্যিক সুবিধাটি বেশি বিবেচনা করে, পাবলিকগুলো তা হয়তো করে না। কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দুনিয়ার কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা বলতে কিছু শ্রেণীপাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান বোঝায় না। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানে কিছুটা প্রস্তুত করা, গবেষণার ধারায় সম্পৃক্ত করা সেগুলোতে আবশ্যকীয়। গবেষণাপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কোনো শিক্ষার্থী স্নাতক বা মাস্টার্স ডিগ্রির সার্টিফিকেট নেবে এমনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ আশা করতে পারে না। অথচ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জানতেই পারে না যে, তাদেরকে প্রথমবর্ষ থেকেই গবেষণাপত্র তৈরি করতে হয়, সেভাবে তাদেরকে গড়ে উঠতে হয়।

গবেষণার ধারণাটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রায় উঠেই গেছে। যৎসামান্য যা-কিছু আছে তা নকল বা পুনরাবৃত্তির পুনঃপৌনিক ধারা ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে এখানে ছাত্রছাত্রীরা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতার পদে

www.pathagar.com

যোগদান করেও অনেকেই লেখালেখি বা পদ্ধতি তত্ত্বীয় গবেষণার সঙ্গে মোটেও পরিচিত নন। সুতরাং তারা ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা করাবেন কোন্ প্রস্তুতি নিয়ে?

শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের পদোন্নতি—এসব বিষয় যেসব নিয়মনীতিতে চলছে তার ফলে মেধাবীদের স্থান কাগজে-কলমে থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনা, পারিবারিক ও আত্মীয়তার পরিচয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। পত্রপত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনেক কলঙ্ক এবং লজ্জাজনক খবর প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা এসব নিয়োগ ও পদোন্নতিতে যুক্ত থাকেন তাদের বেশিরভাগই রাজনৈতিক পরিচয়ে সেইসব পর্ষদে বসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অ্যাকাডেমিক পরিচয়ের চাইতে রাজনৈতিক পরিচয়েই বেশি পরিচিত, প্রভাববিস্তারকারী। এরা খাতা-কলমে রাতকে দিন বানাতে পারেন, কিন্তু রাত ও দিনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেকেই জানেন না, মানেন না। তেমন বই-পুস্তকের সঙ্গেও তাদের পরিচয় খুব একটা নেই। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়, আঞ্চলিক, আত্মীয়-পারিবারিক পরিচয়ে শিক্ষক নিয়োগ লাভের ফলে এখানে কম-মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এরা না পারছেন ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে মানসম্মত পাঠদান করতে, না পারছেন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানে তৈরি করতে, না পারছেন দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে, না পারছেন একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তচিন্তার মানুষরূপে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলতে।

আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার চাইতে সাম্প্রদায়িকতা, দলবাজি ও আঞ্চলিকতার অপচর্চাই বেশি হচ্ছে। এগুলো এখন দিন দিন উগ্রজঙ্গিবাদের আখড়ায় বা ক্যান্টেনমেন্টে পরিণত হচ্ছে। সে-কারণে এখানে শিক্ষার মান, ফ্যাকাল্টির মান, গবেষণার মানসহ কোনো উচ্চতর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে নোবেল পুরস্কার বা আন্তর্জাতিক গবেষণার কোনো স্বীকৃতিতে আমাদের অংশগ্রহণই নেই। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববীক্ষা নেই, উচ্চশিক্ষা নেই, এখন দেখা যাচ্ছে আলয়ও তেমন একটা নেই। তেমন নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে বিশ্বের সেরা পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নেবে ভাবতেও পারি না। সেই জায়গায় প্রবেশের কথা অনেক দূরের ব্যাপার সত্য, তবে জাতির মেধা ও মননের বিকাশের স্বার্থে আমাদেরকে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ধারণার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার প্রচলিত ধারণাতেও বড়ধরনের পরিবর্তন এবং সংস্কার আনতেই হবে। সেখানে হাত না দিলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদমজির মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর বেশিদিন চলতে পারবে না, একদিন আপনাআপনিই সেগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৮ নভেম্বর ২০০৫, দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

হে বিশ্ববিদ্যালয়! তুমি কার ও কেন?

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো শিক্ষকদের মর্যাদা, মেধা, দক্ষতা ও জীবনাচরণ দেখে অভিভূত হতাম। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সময় আমার প্রধান শিক্ষককে দেখে তাঁর মতো একজন আদর্শবান শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। হাইস্কুলে বেশ কজন যোগ্য ও গুণী শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করে জীবনে শিক্ষকতা পেশার বাইরে আর কিছুই করব না, নেব না এমন সংকল্পই করে বসেছিলাম। কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাজীবনে কিছুটা হোঁচট খেয়েছিলাম। যত বেশিসংখ্যক শিক্ষককে ক্লাসে পাচ্ছিলাম তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই আমাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। আমি যখন বৃত্তি নিয়ে মস্কোস্থ গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে চলে যাই তখন অভিজ্ঞতা, জানা ও দেখার সুযোগ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস, দর্শন ইনস্টিটিউটসহ বেশ কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরা অ্যাকাডেমিশিয়ানদের লেকচার শোনার যখন সুযোগ হয়েছিল তখন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা হিসেবে শিক্ষকতার স্থান নির্ণয় করতে আমার আর ভুল হয়নি। আমি দেশে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হব, ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে পড়াব, হাতে-কলমে গবেষণা ও লেখালেখি শেখাব, পাঠ্যবই, গবেষণাপত্র লিখব; অন্তত উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে কিছু একটা করার কাজে জীবনকে ব্যস্ত রাখব—এ-ই ছিল ভাবনাচিন্তা। না, জীবনে একবারও বিদেশে থেকে যাওয়া, অন্য কোনো পশ্চিমাদেশে পাড়ি জমানোর কথা ভাবিনি। দেশে ফিরব, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করব—এ-ধরনের ভাবনা ও অনুভূতিই লালন করেছিলাম।

যথাসময়ে আমার দেশে ফেরা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি আমার হচ্ছিল না। কেউ বলছেন কমিউনিস্ট হয়ে গেছে, কেউ বলছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিহাস আবার পড়ায় নাকি? এই পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিকক্ষক হিসেবে যোগদান করতে বেশ বড়ধরনের ধাক্কা খেলাম। যেখানেই যাই ধরাধরি করতে হবে। অমুকের আশীর্বাদ নিতে হবে, তদবির করতে হবে, কারো-না-কারো পিছু পিছু হাঁটতে হবে, প্রয়োজনে তার বাজার করে দিতে হবে—চারদিকে শুধু এসবই শুনছিলাম। আমি তখন এসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার নিজের কাছে এসব ছিল পৃথিবীর বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা : তা হলে

www.pathagar.com

ইন্টারভিউর প্রয়োজন কেন? এটি কি প্রতারণা নয়? দেশে এত ধর্মের কথা বলে, মানুষ এমন কাজ করতে পারে কী করে? এ কোন্ শিক্ষা পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এমন কাজ করতে পারেন?

আমাকে বলা হল : আপনি অমর্ত্য সেন হলেও আমাদের কিছুই যায় আসে না। আপনার তিনটে দ্বিতীয় শ্রেণী, মাত্র একটা প্রথম শ্রেণী, ডবিসর্গ (ড.) থাকলে তো কথাই নেই—জীবনে সবকটা তৃতীয় বিভাগে পাস হলেও আমাদের দল, অনুগত, নিজস্ব প্রোডাক্ট হলে তাকেই আমরা সিলেক্ট করব, সে-ই চাকরি পাবে। ইয়াং ম্যান! আপনার শিক্ষাজীবনে সব কটাই প্রথম বিভাগ, বিদেশী ডিগ্রি, পিএইচডি—এসবের কানাকড়িরও মূল্য আমাদের কাছে নেই, বরং এটিই আপনার বড় অযোগ্যতা! এই দেখুন না, কীভাবে আপনার সিভি (জীবনবৃত্তান্ত) ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি! ব্যস্! আমাদের কাছে বড় যোগ্যতা হচ্ছে কেবলমাত্র আমাদের প্রোডাক্ট এবং...।

চারদিকে এমন একটি ধারণাই পাচ্ছিলাম, আর ধাক্কা খাচ্ছিলাম। একদিকে এসব যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অন্যদিকে হতাশা আর বিস্ময়ের দোলাচলে দুলছিলাম। তবে কারো সঙ্গে ইন্টারভিউর আগে দেখা করে, কথা বলে, তদবির করে চাকরি না-নেওয়ার প্রতিজ্ঞা থেকে না-সরার অবস্থান গ্রহণ করে এর শেষ পরিণতি দেখতে চেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, আমি এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু এর জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, শিক্ষকতার জীবন বিলম্বিত হয়েছিল, বেকারত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, কাঙ্ক্ষিত স্থানে যোগদান করতে পারিনি, নিজেকে সেই মানে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।

আসলে ব্যক্তিগত এই বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা নয়। আমার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মোটামুটি আমি সচেতন। আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকনিয়োগ নিয়ে যেসব অভিযোগের কথা মাঝে-মধ্যে আপনারা পত্রপত্রিকায় পড়েন তার একটিমাত্র উদাহরণ।

গত ১৫ জুন, দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটির শিরোনাম হচ্ছে, "অবশেষে বিবৃতি : ৮৯ শিক্ষকের ৫০ জনই জামাত-সমর্থক!" এতে বলা হয়েছে, "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান প্রশাসনের আমলে নিয়োগকৃত ৮৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫০ জনই জামাতে ইসলামীর সমর্থক।" এই অভিযোগটি করেছেন এই আমলেই নিয়োগপ্রাপ্ত অপর ৩৯ জন শিক্ষক (!)। তারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী দাবি করলেও তাদের মধ্যে ১৪জন জামাত-সমর্থক আছেন বলেও সন্দেহ করা হয়েছে। কথাটি তারা উল্লেখ করেছেন জামাতের

www.pathagar.com

দেওয়া সংবর্ধনাসভায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৯ জনের মধ্যে ৬৪ জনের উপস্থিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। থলের বেড়াল কীভাবে বের হয়! এভাবেই দেশবাসী বিষয়টি জানতে পারলেন।

১৫ জুন *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে জিয়া পরিষদের রাবি শাখার সভাপতি প্রফেসর আলতাফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এস আব্বাস আলী লিখেছেন, "সকল নিয়মনীতি ও মেধা-যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। কাজেই কতজন কোন্ দলপন্থী সেই প্রশ্ন তোলা অবান্তর।" (১৭ জুন প্রথম আলো)। আমাদের বিজ্ঞ প্রফেসরদ্বয় ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন। প্রতিবেদনটি ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ৩৯ জন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বাক্ষরিত একটি সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রতিবাদকারীদের বোধহয় চোখে সরিষার ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাই তারা যে-প্রতিবাদটি পাঠালেন পত্রিকায় তা পড়ে দেশবাসী তাদের সম্পর্কে কী ভাবছেন তা কি তারা আদৌ ভেবে দেখেছেন?

আসলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যয়েও একটি গোষ্ঠী এখন দলবাজিতে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, নিয়ম-নীতি সবকিছুই এখন তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত সর্বক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, অদক্ষ মানুষগুলো দলের নামে এভাবে সর্বত্রই প্রভাব ও জাল বিস্তার করে বসেছেন। দলে নাম লেখালে চাকরি হয়, প্রমোশন হয়, হর্তাকর্তা হওয়া যায়, মেধাবীদের ওপর ছড়ি ঘুরানো যায়, তাদের বস্ হওয়া যায়, ক্ষমতায় যাওয়া যায়, সুযোগসুবিধা ভোগ করা যায়। মেধার কোনো চর্চাই করতে হয় না, শর্ত পূরণ করতে হয় না, যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। দেশে দলীয় রাজনীতির প্রভাব এখন এমন একটি পর্যায়ে যাওয়ার ফলে এর প্রভাব গিয়ে সবচেয়ে বেশি পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা নেই, সমাজে প্রভাব বিস্তার করার মতো তাদের দলের ছায়াতলে তেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ নেই। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই দেশ ও জাতির কাছে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদার স্থান করে নিয়েছিল, সুতরাং সেখান থেকে দলীয় বুদ্ধিজীবী (!) আমদানির প্রক্রিয়া এভাবেই শুরু করা হল।

আশির দশক পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া তেমন শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে এর কদর বেড়ে যাওয়ায় আগের বাঁধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে। এখন চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পেতে হলে দলে নাম লেখানোর অঘোষিত শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং হাউজ টিউটর, পরিবহনের হর্তাকর্তা, ছাত্রদের পিকনিকের আহ্বায়ক হতে দলীয় পরিচয় এবং আনুগত্যের অপরিহার্যতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ওয়াসার চেয়ারম্যান,বিদ্যুৎ, গ্যাস, যানবাহন, কাস্টমস, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস—অর্থাৎ

www.pathagar.com

পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তরে যে-কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পেতে, গাড়ি হাঁকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মিন্টো রোডে তদবিরে ব্যস্ত। মনে হচ্ছে, বই-পুস্তক নাড়াচাড়া করতে অনেকেরই পছন্দ না। তারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীমান শিক্ষক থাকতে চাচ্ছেন না। প্রশাসক, ক্ষমতাধর, কেউকেটা একজন হলেই তাদের জীবন ধন্য! একেই বলে সব অসম্ভবকে সম্ভব করার দেশ!

দলীয় পরিচয়ে যেসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করেন তাদের অনেকেরই প্রথমশ্রেণী প্রাপ্তিও দলীয় প্রভাব এবং পরিচয়েই ঘটে থাকে। আমার নিজের চোখে দেখা এসব ঘটনাকে আমি ঢেকে রাখতে পারি না। অযোগ্য শিক্ষক কখনোই কোনো মেধাবী ছাত্র তৈরি করতে পারেন না। তাদের হাতে পড়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি হতাশ হয়ে পড়ে, লেখাপড়ায় পথ ছেড়ে দেয়, নষ্ট পথে পা বাড়ায়; ফাঁকিবাজি, দলবাজি ও স্বার্থবাদী হতে শেখে। অথচ আমার দেখা ও জানামতে, বাংলাদেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে; মেধা, সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষরও রাখছে। দেশে কৃতী ছাত্রছাত্রীর যে-বহরটি এখন আমাদের চোখে দেখা যাচ্ছে একটি বড় অংশই অনৈতিক, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলবাজির খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও এরাই তাদের গুরুদের মতো 'সাফল্য' লাভ করছে। প্রকৃত মেধাবীরা আড়ালেই পড়ে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে, অবশেষে হারিয়েও যাচ্ছে।

মেধাবী, বিবেকসম্পন্ন ও সৎ শিক্ষকদের আদর্শকে অনুসরণ করে কেউ মেধাবী হতে পারবেন, প্রথম বিভাগ পাবেন, যথার্থ প্রথম স্থান অর্জন করবেন, সেই মোতাবেক শিক্ষকতার চাকরি পাবেন—এমন আশা একযুগ আগে করলেও এখন যে একেবারেই সম্ভব নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি যারা শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করার সুযোগ পেয়েছেন তাদের দলীয় পরিচয়। গত দেড়বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়গুলোতে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের জামাত অথবা বিএনপির পরিচয় অর্জন করতেই হয়েছে, এর বাইরে মনে হয় না তেমন কেউ নিয়োগ লাভ করতে পেরেছেন। বাংলাদেশে তা হলে প্রকৃত মেধাবীরা জামাত বা বিএনপি না হলে কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারছেন না—পারবেনও না। এটিই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে! ধরে নিলাম জোটসরকার ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আগামী ২৫ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকছে। তাহলে তো এদেশে যে-কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে জামাত বা বিএনপিই করতে হবে! দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ততদিনে আওয়ামী বা ভিন্নমতের আর যারা আছেন তারা শেষ হয়ে যাবেন। তখন মাশাল্লাহ, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা শিক্ষক

www.pathagar.com

হবেন তারা সবাই জামাত-শিবির এবং বিএনপিই করবেন! তারা তখন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের কী শেখাবেন? বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আসলে কী বোঝানো হয়ে থাকে, বোঝা উচিত—তা কি কেউ একটুও ভেবে দেখেছেন? বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান শেখা ও চর্চার ক্ষেত্র। এটি কোনো দলীয় অফিস নয়।

জামাত-বিএনপির জন্মের দুই-আড়াই হাজার বছর আগেই বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে, পৃথিবীতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিকাশও ঘটেছে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীটা অনেক বড়। বাংলাদেশেও অসংখ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হচ্ছে। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় মনে হচ্ছে এখনো কমবেশি দলীয় প্রভাবমুক্ত (দু-একটি ব্যতীত) পরিবেশে চলেছে। একটু খবর নিন, জেনে দেখুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'মেধা-যোগ্যতার ভিত্তিতে' (দাবিকৃত) নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা কেমন পড়াচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের, কত ঘণ্টা দলীয় কাজে সময় ব্যয় করেন। দয়া করে এদের একটু বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দিন,দেখুন তাদের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। না, আমি শুধু তাদের কথা এককভাবে বলছি না; বলছি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার পেছনে অযোগ্য শিক্ষকদের পাঠদানও অন্যতম প্রধান কারণ, তা স্বীকার করতেই হবে। এদের সংখ্যা এখন কেমন ভারী হচ্ছে, নিরঙ্কুশ ও একচেটিয়া হচ্ছে, তা ১৫ জুন *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত সংবাদ থেকেই বোঝা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'প্রফেসর' পদে আসীন শিক্ষকের সংখ্যা এখন আমাদের এতই বেশি যে, আমরা ইতিমধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ উন্নত দুনিয়াকে এক্ষেত্রে পেছনে ফেলে চলে এসেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় সুইডেনের মফস্বলের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এখন যতটুকু সাফল্য প্রতিবছর রাখছে, আমরা সম্মিলিতভাবে সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় তা রাখতে পারছি না। এই প্রক্রিয়ায় চললে তা আর কোনোদিন পারব তেমন আশা করা যায় না। আমাদের শিক্ষক নিয়োগ, তথাকথিত গবেষণা, পিএইচডি ডিগ্রি, পদোন্নতি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই মেধার চেয়ে দলীয় পরিচয় ও তদবির এখন এক নম্বর অঘোষিত কিন্তু বাধ্যতামূলক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কিছুকে ব্যবহার করে আমরা যে-প্রতিষ্ঠানকে এখন বিশ্ববিদ্যালয় বলি, তাতে বিশ্ববীক্ষা, দীক্ষা, শিক্ষা—এর কোনোটিই আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। যদি থাকত তাহলে এমন নির্লজ্জভাবে দলবাজি, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, জালিয়াতি করতে যে-কোনো মানুষেরই বিবেক বিদ্ধ হত। কিন্তু না, তেমনটি ওই পাড়ায় এখন আর হয় না। ওখানে এখন বরং তাদেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাজত্ব কায়েম হয়েছে—যারা ইতিহাস বিকৃত করতে পারেন; মিথ্যাচার, দলবাজি, ধান্দাবাজি করতে পারেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় নামক ওই প্রতিষ্ঠানগুলো থাকায় ওই মানুষগুলোর চাকরি হয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে, এই রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর তাদের প্রভাব বেড়েছে। এর চেয়েও বড় সত্য হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, মেধা, মনন, সততা ও বিবেকের চর্চা অতিদ্রুত এই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে নির্বাসনে যেতে বসেছে। একদিন ওই দালানগুলো জ্ঞানবিজ্ঞানশূন্যই হয়ে পড়বে। ওইগুলো ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে দলীয় ক্যাডার, সন্ত্রাসী ও মস্তানদের আখড়ায় পরিণত হবে। একবিংশ শতাব্দীর চেতনা থেকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ছিটকে পড়েছে সেটি দিব্যি দেখা যাচ্ছে। সেজন্যই বিশ্ববিদ্যালয় নামক আমার প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হয়। বলতে বাধ্য হচ্ছি : হে বিশ্ববিদ্যালয়! তুমি কার ও কেন? আমি কিছুই জানি না, বুঝি না। তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুই করার নেই।

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আমাদের অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা

গত কয়েকদিনের মধ্যে খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেছে। এর একটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ক্যাটরিনা ও রিটা এবং অপরটি হচ্ছে পাকিস্তান-কাশ্মিরের ভয়াবহ ভূমিকম্প। মাত্র ৯/১০ মাস আগে ভারত মহাসাগরে ঘটে যাওয়া সুনামির কথা এখনো আমরা ভুলে যাইনি। প্রায় প্রতি বছরই পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, অস্বাভাবিক বন্যা, শীতের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেই থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অতিক্রম করেই আমরা বেঁচে আছি, থাকি এবং থাকব। তবে কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে খুব হঠাৎ করেই, বলা চলে কোনো ধরনের আগাম সাড়া-সংকেত না দিয়েই; যেমন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আমাদের প্রায় জানাই থাকে না। ভূমিকম্পের বিষয়টি সবচেয়ে আকস্মিক দুর্যোগ হিসেবেই সর্বত্র চিহ্নিত, বিবেচিত। এর থেকে বেঁচে যাওয়াটা অনেকটাই নির্ভর করে সেই সময় ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থানের ওপর।

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জানা ও শোনার সুযোগ কমবেশি পাওয়া যায়—বাঁচার চেষ্টা করা হলে নিজেকে অন্তত রক্ষা করাও সম্ভব হয়। কিন্তু ভূমিকম্পের বিষয়টি একদম আলাদা । বলা চলে এটিই এখনকার দিনে সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আমাদের সারাক্ষণ তাড়িত করছে, ভাবিয়ে তুলছে। কেননা, আমরা এখন দেখছি ভূমিকম্পের ফলে কীভাবে হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তের মধ্যে বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়, আহত-পঙ্গু হয়ে পড়ে। জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামি আর ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ এতটাই আলাদা আলাদা গভীর জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়—যা সম্পর্কে কেবলমাত্র স্ব-স্ব ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা নতুন কোনো কথা শোনা বা জানা যেতে পারে। ওখানে আমার মতো মানুষের কিছু লেখার চেষ্টা করাই হবে ধৃষ্টতা। তাই আগেই বলে রাখি, আমার উদ্দেশ্য ঐসব জটিল বিষয় নিয়ে লেখা নয়, কাউকে কিছু বলাও নয়। তবে লেখার শুরুতেই যে-কথাটি উল্লেখ করেছিলাম তার সূত্র ধরে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর কোথাও হঠাৎ ঘটে গেলে আমরা বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে

www.pathagar.com

নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, কেন করি, আমাদের কী করা উচিত-অনুচিত ইত্যাদি কিছু বিষয়ে কিছু কথা বলা অপরিহার্য মনে করছি। কেননা আমরা বর্তমান সভ্য দুনিয়ার মানুষ বলে নিজেদের দাবি করি, জেনে আসছি, অথচ কোথাও কোথাও ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখে আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো কোনো কোনো সময় প্রতিভাত হয় না যে আমরা খুব একটা সভ্য হয়েছি। এই না-হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে জ্ঞানের দিক থেকে আমরা দারুণভাবে পিছিয়ে আছি, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও আমরা উন্নত মানুষ হতে পারিনি, আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে যুক্তি, জ্ঞানবিজ্ঞানের ছাপ এসব ক্ষেত্রে মোটেও পড়তে দেখি না।

তাহলে মূলকথাতেই ফিরে আসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে হ্যারিকেন ক্যাটারিনা আঘাত হেনেছিল তাতে বাড়িঘর, সম্পদ, মানুষ ও প্রাণীর জীবননাশের অসংখ্য দৃশ্য পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এ নিয়ে নানা সমালোচনার ঝড় ওঠার খবর মিডিয়ার কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি। ক্যাটারিনার ছোবল সামলিয়ে ওঠার আগেই যখন হ্যারিকেন রিটার কথা শোনা গেল তখন আমাদের দেশে অনেককেই বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, দোকানপাট, বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থানে এমন সব মন্তব্য করতে শুনেছি—যা আমাকে দারুণভাবে অবাক এবং যারপরনাই ব্যথিত করেছে। তাদের অধিকাংশের কথায় মনে হচ্ছিল যে, মার্কিনিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এভাবেই করতে হবে, সৃষ্টিকর্তা এভাবেই যেন পৃথিবীর পাপীদের বিচার করেন, ধ্বংস করেন। কথা বলার সময় ঐসব ব্যক্তি যে ভাষা ও বক্তব্য ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হচ্ছিল, যেন সৃষ্টিকর্তা মার্কিনিদের রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঐভাবেই শেষ করে নিতে যাচ্ছে এবং তারা এ-সম্পর্কে জ্ঞাত; হয়তো সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তাদের এ-সম্পর্কে কথা হয়েছে। একদিন মিশরের ফারাওদের ঐশ্বর্য, শক্তি যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল, মার্কিনিদেরও তেমনি দিন শেষ হয়ে আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একধরনের আত্মতৃপ্তির বোধই ঐসব মন্তব্যে আমি শুনতে পেয়েছি বলে মনে হচ্ছিল। বলা বাহুল্য, ঐসব কথায় অংশ নিতে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অনেক অধ্যাপককেও। অন্যদের কথা আর নাইবা বললাম। এর মাত্র কয়েকদিন পর ভয়াবহ ভূমিকম্পে যখন পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মিরে বড়ধরনের বিপর্যয় নেমে আসল তখন তাদের অনেকেই চুপসে গেলেন, কেউ কেউ আবার বলতে শুরু করলেন : আল্লাহ মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষা করছেন এসব দুর্যোগ দিয়ে! বলিহারি যুক্তির শেষ নেই! আল্লাহ কী চাচ্ছেন না চাচ্ছেন সেক্ষেত্রেও আমরা বানিয়ে এটা-সেটা বলে দিচ্ছি, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে চালিয়ে দিচ্ছি! একেই বলে কুশিক্ষার দৌরাত্ম্য!

কুশিক্ষার দৌরাত্ম্য এ-কারণেই বলছি যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানার মতো লেখাপড়ার সুযোগ খুবই সীমিত, একে

www.pathagar.com

এককথায় কোনো শিক্ষাই বলা যাবে না। 'ইহা পদার্থ', 'ইহা রসায়ন', 'ইহা প্রাণিজগৎ'— এ-ধরনের পাঠ ও বিষয়-পরিচিতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রকৃতির স্বরূপকে সম্যকভাবে বোঝা, ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতির জগৎটাই অসীম। অসীম এই প্রকৃতি সম্পর্কে জানা, বোঝা, ধারণা লাভ করা খুব-একটা সহজ কথা বা কাজ নয়।

একসময় মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানত না। মানুষের জানার একমাত্র উপায় ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামাত্র। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে এই অসীম জটিল প্রকৃতিকে যথার্থ অর্থে বোঝা ও জানা—বিশেষত প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভ করা মোটের ওপর অসম্ভব ছিল। তখন মানুষ বাধ্য হয়েই প্রকৃতিকে ঘিরে কল্পনার ফানুস উড়িয়েছে; নানারকম বিশ্বাস-অবিশ্বাস, কল্পকাহিনী ভূত-পেত্নী, দেব-দেবীর আশ্রয়-ভরসাকে নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে স্থান করিয়ে দিয়েছিল। কালক্রমে মানুষের জানার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় চারদিকের জগৎ, প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ। ঐসবের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন মানুষ উত্থাপন করেছে, লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এসবকে মানুষই জানতে শুরু করেছে।

সবকিছু সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে অবলম্বন করে যে বিশ্বাস আর বোধসম্পন্ন মানবসভ্যতা গত আড়াই-৩ হাজার বছর ধরে তিলে তিলে মানুষ গড়ে তুলেছে, তাতে প্রকৃতিকে আর অজ্ঞেয়, মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো জগৎ ভাবার কোনো কারণ থাকেনি। মানুষ সীমাহীন প্রকৃতির রহস্যকে একে একে আবিষ্কার করে চলেছে। উন্মোচিত হতে থাকে অসীম এই প্রকৃতির জগৎ, এর উৎপত্তি, বিস্তার ও সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বারও। শিক্ষ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষাই মানুষের কাছে বিস্ময়কর প্রকৃতিকে এখন এর সম্পূর্ণ স্বরূপে ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করে তুলছে। ফলে প্রকৃতি সম্পর্কে এখন আর মানুষকে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে চলতে হচ্ছে না। প্রকৃতির সুপ্ত নিয়মাবলি সম্পর্কে জানতে পেরেই মানুষ প্রকৃতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়ে চলছে, পৃথিবীর প্রকৃতিকে জয় করে এখন সৌরজগতের বিভিন্ন প্রান্তেও মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে।

এটি সত্যিই ভাবতে অবাক হওয়ার কথা যে, মানুষ মাত্র ৪/৫ হাজার বছর আগেও যে প্রকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না, প্রকৃতির সব রহস্যকে ঘিরে যতসব আজব আজব কল্পকাহিনী মানুষ জন্ম দিয়েছে, বিশ্বাস করেছে—এখন কিন্তু সেই মানুষই প্রকৃতিকে নিয়ে আর আগের মতো অবাস্তব বিশ্বাসে আবদ্ধ নেই। বরং প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে মানুষ কার্যকরণ খুঁজছে, রহস্যকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে শিখেছে। ফলে প্রকৃতিতে এখন আর অসহায় বা বিপন্নবোধ করার অবস্থায় মানুষ নেই। বরং প্রকৃতিকে তার প্রকৃত পরিচয় বা সত্তায় জ্ঞাত হয়ে মানুষ একে জয় করে চলছে, কাজে লাগাচ্ছে মানুষের উন্নত জীবন গড়ার ক্ষেত্রে। এর মধ্যে দিয়েই সমাজের লাখো কোটি মানুষ প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের চিন্তনকে কাজে

www.pathagar.com

লাগাচ্ছে, জানছে, জানতে চেষ্টা করছে। যতবেশি মানুষ এসব সম্পর্কে জানতে পারছে ততবেশি মানুষের চিন্তার জগৎ অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারমুক্ত হচ্ছে; প্রকৃতিকে আর রহস্যময়ী, কল্পনাশ্রয়ী, অতীন্দ্রিয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে কিংবা সৃষ্টিকর্তার আক্রোশ পূরণ করা, মানুষকে শায়েস্তা করার কোনো বিষয় হিসেবে অতীতের মতো ভাবছে না; ভাবার কোনো কারণ বলে দেখছে না। এখন মানুষ এই প্রকৃতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করার মতো পর্যায়ে চলে এসেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা-উপশাখায় নিরন্তরভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন করে মানুষ প্রকৃতির সকল রহস্যভেদ করে চলছে, জ্ঞান অর্জন করে চলছে, মানুষের কল্যাণে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার কাজেও আত্মনিয়োগ করছে। পৃথিবীর আধুনিক মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক এখন এমন পর্যায়ে অবস্থান করছে।

দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা নেই, জানার তাগিদও তেমন একটা নেই। আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের মৌলিক চর্চা, গবেষণা ও চিন্তাকে বাদ দিয়ে 'দক্ষ জনশক্তি' নামক একটি কথা খুব জোরেশোরে উচ্চারণ করছি। জানি না, মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ও চিন্তাকে বাদ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি কীভাবে তৈরি হবে। এটি যে আদৌ হচ্ছে না, হওয়ারও নয়, তা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রোডাক্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমি প্রায়ই আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত (সার্টিফিকেটধারী) এবং একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ, বিশ্বাস, বোধ এবং কাজের মধ্যে তেমন মৌলিক গুণগত কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। না-পাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে—আমাদের শিক্ষায় নেই কোনো বিজ্ঞানচিন্তা, যুক্তি ও মৌলিক চিন্তা। ফলে আলোকিত মানুষ গড়ার কোনো সম্ভাবনাও এতে নেই। সে-কারণেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো দুর্ঘটনা দেখলে আমরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি তা সভ্যতা-পূর্ববর্তী যুগেই ছিল মানানসই, বর্তমান যুগে অন্তত নয়।

১৬ অক্টোবর ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০০৫ : কতটা স্বাভাবিক, কতটা ভালো?

কিছুদিন আগে একজন কলেজশিক্ষক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জানালেন যে, এই বছর এইচএসসি পরীক্ষা পাসের হার হয়তো ৬০ শতাংশ অতিক্রম করবে। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, এ-বছর বোর্ড-কর্তৃপক্ষ উত্তরপত্র গ্রহণকালে পরীক্ষকদের মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—যেন উত্তরপত্র শক্ত হাতে নয়, বরং উদারভাবে মূল্যায়িত হয়। তিনিসহ তার সহকর্মী যারা এ-বছর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন তারা বোর্ডের মৌখিক নির্দেশ শিরোধার্যভাবে পালন করেছেন। ফলে তাদের হাতে পাসের হার এ-বছর আগের বছরের চেয়ে বেশি হয়েছে। নিজেদের মধ্যে একান্ত আলাপ-আলোচনায় তারা জানতে পেরেছেন যে পাসের হার এবার বেশ বেশি হয়েছে। তা থেকেই আমার পরিচিত কলেজশিক্ষকটি বেশ আগেই অনুমান করেছিলেন এবার পাসের হার ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। ২৬ সেপ্টেম্বর যে-ফলাফলটি ঘোষিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সিলেট শিক্ষাবোর্ডের পাসের হার ৪৪ দশমিক ৪০ শতাংশ না হয়ে তা যদি অন্য বোর্ডের কাছাকাছি হত তাহলে তো গড়ে সব শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৬০ শতাংশ অনায়াসেই অতিক্রম করে যেত। এখন এই পাসের হার ৫৯.১৬ শতাংশ হয়েছে।

আমার পরিচিত কলেজশিক্ষকের আগাম বলে দেওয়া কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তবে আমি অবাক হয়েছি এ-বছরের ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক যখন বলেন যে, নকল বন্ধ হওয়ার ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সবাই লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে বাধ্য হয়েছেন। গত বছরও তো প্রায় একই পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তখন পাসের হার ছিল ৪৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ বছর তা হুট করে লাফিয়ে ৫৯.১৬ শতাংশে উন্নীত হল কীভাবে? তাহলে কি আমাদের ভাবতে হবে যে, গতবছরের চেয়ে এবারের ছাত্রছাত্রীরা বেশি ভালো ছিল? দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীকে এভাবে কি মূল্যায়ন করা যায়? না, সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, ঠিকও না—অথচ আমরা ফলাফলটি এমনই পাচ্ছি। তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতিতে এভাবে ফলাফল ওঠানামা করে

www.pathagar.com

থাকে। কেউ তা ইচ্ছা করলে উপরে ওঠানো যায়, ইচ্ছা না করলে তা বেশ নিচে নেমে যেতেও পারে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর অধিকাংশ পত্রপত্রিকা সন্তোষ প্রকাশ করে সম্পাদকীয় লিখেছে। দেশব্যাপী জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৫০৯ জন হওয়াকেও একটি বড়ধরনের সাফল্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যতবেশি মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে আমরা ততবেশি খুশি হব, জাতি ততবেশি লাভবান হবে। কিন্তু সেই মেধা-নির্ণয়টিতে সর্বপ্রথম স্বচ্ছতা থাকতে হবে, তবেই কেবল প্রকৃত মেধাবীর যাচাইটি যথার্থভাবে হতে পারে। মেধার যাচাইতে যদি মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনায় ম্যানুপুলেশনের সুযোগ থাকে, তাতে যদি নির্বাচনের মতো ইস্যু কারো-কারো মাথায় থাকে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে যদি পাসের হার, জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায়; তাতে সাময়িকভাবে কেউ কেউ লাভবান হতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী শিক্ষাজীবনে প্রবেশের পথে বড়ধরনের হোঁচট বা ধাক্কা খেতে পারেন অনেকেই। নির্বাচন ছাড়াও আর-একটি বিবেচনা যদি বোর্ড-কর্তৃপক্ষের কিংবা সরকারের কোনো কোনো মহল থেকে ম্যানুপুলেশনে কাজ করে থাকে যে—দেশে যে হারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে অনার্স খোলা হয়েছে, তাতে এইচএসসি পাসের হার সন্তোষজনক না হলে ঐসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রসংকটে ভুগবে—তেমন বিবেচনা যদি কোথাও কাজ করে থাকে তাহলে তো জাতির ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। জানি না কোন্‌টা কোন্ প্রক্রিয়ায় কতখানি বিবেচিত হয়েছে, ভূমিকা রেখেছে, তবে ১ বছরে ১২-১৩ শতাংশ পাসের হার বৃদ্ধির চমক ফলাফলে দেখানো সম্ভব হলেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মান ১ বছরে কতখানি বেড়েছে, লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তা বলা বা দাবি করা মুশকিল। তা কতখানি যথার্থ জানি না, তবে সেরকম কোনো জরিপ দেশে আদৌ হয়েছে বা হচ্ছে কি না—বলা মুশকিল।

তাছাড়া নকল সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হয়ে গেলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় রাতারাতি আলাদীনের চেরাগ জ্বলে উঠবে, পাসের হার বছরে ১২-১৩ শতাংশ হারে বেড়ে যাবে, তেমন আইডিয়াল সিচুয়েশন দেশে এখনো তৈরি হয়নি। বিশেষত কলেজপর্যায়ে লেখাপড়ার যে-পরিবেশ তাতে লেখাপড়ার চেয়ে কলেজ দখলে রাখা, মারামারি করা, ছাত্রসংগঠনের তথাকথিত নেতৃবৃন্দের টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্যবাজি, অধ্যক্ষ-শিক্ষকদের নানাধরনের রাজনৈতিক তোপের মুখে রাখার যে জঘন্য ব্যবস্থা দেশের বেশির ভাগ কলেজে তৈরি হয়েছে তাতে লেখাপড়ার পরিবেশ কতখানি সৃষ্টি হয়েছে—দেশের হর্তাকর্তাদের আমি বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করে দেখতে বলব। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কারণে

www.pathagar.com

দেশের কয়েকশো সরকারি-বেসরকারি কলেজের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও যাতায়াত রয়েছে। আমার নিজের চোখে দেখা পরিবেশ তো বলে না যে, কলেজগুলোতে সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা আগের চেয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারছে, করছে; শিক্ষকরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছেন—এর কোনোটিতেই কোনো অগ্রগতির সূচক আমাদর অন্তত চোখে পড়েনি। প্রতিটি কলেজই এখন হয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নতুবা ছাত্রশিবিরের অধীন, কোথাও কোথাও ছাত্রলীগের দুএকটি ব্যানার চোখে পড়ে হয়তো।

কলেজ-অধ্যক্ষরা অগ্নিকুণ্ডের মুখে কতখানি আছেন, কতখানি তথাকথিত ছাত্রনেতাদের স্থানীয় এমপি, মন্ত্রী, সরকারি দলের নেতাদের চোখে থাকেন—তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। প্রতিদিন প্রতিটি কলেজে কতটি ছাত্রমিছিল হয়, কতটি ক্লাস হয়, ছাত্রমিছিল ও ক্লাসে উপস্থিতির হার, ধরন-ধারণ কী—তা যদি খোঁজ নিয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কথা বলতেন তাহলে তারা বলতে পারতেন যে, ছাত্রসংগঠনের দৌরাত্ম্যে কলেজগুলো কতখানি লেখাপড়াবিমুখ হয়েছে; ছাত্রনেতা নামধারীরা আদৌ লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছে কি না; নাকি তারা মন্ত্রী, এমপি, স্থানীয় দলীয় নেতাদের অফিসে ভিড় করেন; তাদের গাড়িতে ঘুরে বেড়ান; টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, প্রভাব বিস্তারে কতখানি ব্যস্ত আছে। সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের সাধারণ কর্মীরাও এখন আর নিজেদের কর্মী বা ছাত্র ভাবেন কি না—তা দেখার বিষয়। তাদের ক্লাসে উপস্থিতি, বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি কোনোটিই আছে কি না দয়া করে কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা করে দেখতে বলব। তারপর তারা যদি বলেন, নকল বন্ধ হওয়ার ফলে পরীক্ষার ফলাফলে এমন অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাহলে বোঝা যাবে দাবিটির সঙ্গে বাস্তবতার মিল আসলে কতখানি রয়েছে।

নটরডেম, ভিকারুন্নিসা, রাজউক, ক্যাডেট কলেজের মতো দখলদারিত্বমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ বাংলাদেশে কয়টি কলেজে আছে—সে তো সকলেরই জানা কথা। হ্যাঁ, ঐসব কলেজে যারা পড়াশোনা করতে আসে তাদের নিয়মিত ক্লাসে যেতে হয়, লেখাপড়ার ব্যস্ততাতেই তাদের দিনমান কাটে, কলেজের স্বাভাবিক ক্লাসের পরও ছাত্রছাত্রীদের একাধিক টিউটরের কাছে গিয়ে পড়তে হয়। এসব কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীরা বড়ধরনের একটি বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই আসে। এরা যথার্থ অর্থেই লেখাপড়ায় যুক্ত থাকে, থাকতে বাধ্য হয়। তারপরও এ-ধরনের কলেজেও অনেক ছাত্রছাত্রী সবসময় আশানুরূপ ফলাফল দেখাতে পারে না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে দেশের অন্য দেড় থেকে ২ হাজারের মতো কলেজ রয়েছে যেগুলোতে অবকাঠামোগত হাজারো অভাবের পাশাপাশি ছাত্রসংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য, দখলদারিত্ব, মারামারি, শিক্ষাবিমুখ পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের লেকাপড়ার সাধারণ মান, শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি অতিক্রম করে

www.pathagar.com

ভালো ফলাফল পাওয়ার বিষয়টিই নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। তারপরও আমরা দেখছি কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হচ্ছে, ব্যত্যয় ঘটছে, উত্তীর্ণ বা কৃতিত্বের একটা স্বীকৃতি তো আছে।

এ-বছর এত ভালো ফলাফল অর্জিত হওয়ার পরও দেখা গেছে যে, ৪৮টি কলেজ থেকে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি, কয়েকশো কলেজ আছে যেগুলোর পাসের হারও তেমন সন্তোষজনক নয়। কেন দেশের এত বিপুলসংখ্যক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে, তাদের ওই ধরনের ফলাফলের পেছনে কী কী কারণ রয়েছে তা নির্ণয় করার চেষ্টা খুব-একটা হচ্ছে না। ঐ ছাত্রছাত্রীরাই তো মাত্র ২ বছর আগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, এখন তো তাদের একেবারে অকৃতকার্য হওয়ার কোনো কারণ থাকার কথা নয়। তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে তাদের অকৃতকার্য হওয়ার পেছনে। সেই কারণগুলো উদ্‌ঘাটন করতে হবে, তবেই বোঝা যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এত বিচিত্র সব ভারসাম্যহীন অভিজ্ঞতা তৈরি হচ্ছে কেন!

সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা এখন শিক্ষায় বিরাজ করছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে। গ্রামের বেশিরভাগ স্কুল ও কলেজ চলছে নামমাত্র, সেগুলোতে লেখাপড়ার সুযোগসুবিধা ও পরিবেশ ক্রমেই শূন্যের কোঠায় এসে স্থির হচ্ছে। এমনকি উপজেলা ও অপ্রধান জেলাপর্যায়েও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান এখন নিম্নমুখী। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছাত্ররাজনীতির নামে বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের চেয়ে দলীয় এবং দুর্নীতির বিষয়গুলো প্রাধান্য পাচ্ছে, লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের এমনিতেই পিছিয়ে পড়ার যেসব কারণ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো নিরসনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে এসব কলেজে যেসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ কল্পনা করাই দুরাশা মাত্র; তাদের জন্য স্বাভাবিক পাঠদান ও শিক্ষাক্রম চালিয়ে নেওয়াও অনেক কলেজের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বা নেওয়া যাচ্ছে না। মফস্বল এলাকার সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষকদের বদলি, দূরবর্তী শহরে অবস্থান, শিক্ষক-স্বল্পতা একটি পুরোনো অথচ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করার সমস্যা। এসব কারণেও মফস্বল এলাকা বা অপ্রধান শহরের সরকারি কলেজের লেখাপড়ায় মান মোটেও বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং স্বাভাবিক পাঠদান অব্যাহত রাখাই কঠিন সমস্যা হয়ে বিরাজ করছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে ফলাফল হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা মোটের ওপর অসম্ভব। কেননা, উত্তরপত্র ছেড়ে দিয়ে মূল্যায়ন করলে পরীক্ষার্থীরা যে নম্বর পাবে, তা স্বাভাবিক নিয়মে মূল্যায়িত হলে তেমনটি না-হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

www.pathagar.com

আমাদের পাবলিক পরীক্ষায় অনেককিছুই সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যথাযথ মানে পরিচালনা করা, পাঠদানের ব্যবস্থা করা অনেক জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবেই শিক্ষাব্যবস্থায় তেমন নিয়মনীতি কার্যকর করা ছাড়া সেই কাজকে বাদ দিয়ে পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রতিবছর মাতম করা কিংবা বগল বাজানো কোনো শিক্ষাশ্রয়ী কাজ হতে পারে না—এই সত্যটি শিক্ষামন্ত্রণালয়, প্রচারমাধ্যম, দেশের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সব স্তরের মানুষকে বাস্তবতাবোধ দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। সেই কাজটিই দেশে হচ্ছে না। হচ্ছে না বলেই ম্যানুপুলেশন হচ্ছে, নতুন নতুন কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু আসল সত্য হল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আশানুরূপ কোনো মান অর্জিত হচ্ছে না। এটি এখন প্রকৃত শিক্ষার সাধনা, চর্চা ও অধ্যবসায় থেকে অনেক অনেক পেছনে পড়ে আছে।

১২ অক্টোবর ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

বিপর্যয়টা পরীক্ষার ফলে নয়, শিক্ষাব্যবস্থাতেই

মাত্র কিছুদিন আগে যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের ডিগ্রি পাস ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় তখন পত্রিকাগুলো একে 'মারাত্মক ফল বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছিল। কারণ পাসের হার ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ। সম্প্রতি ৭টি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাগুলো এবার প্রায় একই শিরোনামই ব্যবহার করেছে। এসএসসিতে পাসের হার মাত্র ৩৫.৯১ শতাংশ, দাখিল পরীক্ষায় ৪১.৮৭ ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৪০.৭২ শতাংশ। আর মাত্র কিছুদিন পরই এইচএসসি ও ফাজিল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওইসব পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম কিছু হবে না। ইতোমধ্যে কয়েকটি পত্রিকা স্কুল ও মাদ্রাসা পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী বা মন্তব্য-প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

কোনো পত্রিকার পক্ষেই দেশের সবকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর জরিপ চালানো সম্ভব নয়। তারপরও পত্রিকার সাংবাদিকগণ গ্রাম বা শহরের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর জরিপ চালিয়ে যখন একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন তখন তাতেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাঠকগণ লাভ করে থাকেন। আবারো বলছি, এটি সাংবাদিকদের একধরনের চকিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতভিত্তিক ধারণা বা প্রতিবেদন। আমার বিবেচনায়, এটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দিতে বা পেতে যথেষ্ট নয়। সঠিক ধারণা বা তথ্য প্রমাণ পাওয়ার জন্য আমাদের নির্ভর করা উচিত ছিল পেশাদারি কোনো সংস্থার দেওয়া তথ্যের ওপর। কিন্তু বাংলাদেশে তেমন সংস্থা কোথায়? বেনবেইসসহ সরকারি সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্য যে বাস্তবভিত্তিক নয়, বেশ পুরোনো, মাঠপর্যায়ে নেওয়া জরিপ থেকে নয় (অফিসে বসে বানানো তথ্য বলে অভিযোগ আছে)—সেকথা অনেকবারই বলা হয়েছে, হচ্ছেও। তাতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তারপরও আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে ওইসব পরিসংখ্যানের ওপর, যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দারুণভাবে প্রশ্ন ও সন্দেহ আছে। এসব অনির্ভরযোগ্য এবং পুরোনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দেশে শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখি চলছে। অথচ

www.pathagar.com

কম্পিউটার-প্রযুক্তির এমন সুযোগসুবিধা থাকার পরও আমরা পারছি না দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখার মতো দলিল তৈরি করতে, প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলার মতো পরিসংখ্যান ও তথ্য হাজির করতে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। গত কয়েক বছর যাবৎ পাবলিক পরীক্ষার এমন উপর্যুপরি ফলাফল বিপর্যয়কে সরকার নকল-প্রতিরোধের সাফল্য হিসেবে দাবি করে আসছে। এমনও দাবি করা হয়ে থাকে যে, এর ফলে দেশে পড়ালেখার মান নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না, করাটা কতখানি ঠিক হবে জানি না। তবে দেশের বিশাল এসব পাবলিক পরীক্ষায় সর্বত্র নকল স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা কতখানি সম্ভব হয় তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া প্রশ্ন উঠছে, এ বছর যে ৬ লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা কি সকলেই নকলের ওপর নির্ভরশীল ছিল? অন্য কোনো কারণ কি তাদের ফল-বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিল না? কেন এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নকলের ওপর নির্ভর করবে? সেসব কারণ কি আদৌ খুঁজে দেখা হচ্ছে? প্রতিকারের কোনো উপায় কি বের করা হচ্ছে? যারা কৃতকার্য হয়েছে, তাদের কত শতাংশ দুবছর পর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে? সেখানেও যদি ৪০ শতাংশের নিচে ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়, তাহলে তাদের এসএসসি পাসের যৌক্তিকতা কতখানি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তোলা যায়। বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

আমি যদি আর-একটু অন্য অবস্থান থেকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি, ভাবতে বলি—তাহলে কেমন হয়? দেখুন, আমাদের পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে মাতামাতি বহুদিনের। সম্প্রতি গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় মাতামাতির নতুন ইস্যু সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। কিন্তু মূল জায়গায় অতীতে বা বর্তমানে কোনো পরিবর্তন আসেনি, আনার কোনো চিন্তাভাবনাও হচ্ছে বলে মনে হয় না। গতানুগতিক প্রশ্ন করা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা, পরীক্ষার ফল তিন মাসে প্রকাশ করা; কে মেধাবী ছাত্র, কে মেধাহীন ছাত্র এভাবে বিষয়টিকে বিভক্ত ও নির্ণয় করা—এ নিয়েই গত অন্তত ৪ দশক ধরে আমরা চলছি। আমাদের নীতিনির্ধারকগণ আদৌ কখনো ভেবে দেখেছেন কিনা যে, এ-পদ্ধতিতে আমাদের লাখ লাখ তরুণ-তরুণীকে আমরা প্রতিবছর আসলেই শিক্ষার আসল লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পেরেছি কি? এ-সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান দাঁড় করানো গেলে, কিংবা সমীক্ষা দাঁড় করানো গেলে একটি চিত্র ফুটে উঠত। না, এ-পর্যন্ত তা কিন্তু হয়নি। অথচ কে না জানেন বা বোঝেন যে, বর্তমান পদ্ধতিতে নেওয়া পাবলিক পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও যাচাইয়ে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়।

আসলে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে যত ঢাকঢোল বাজানো হচ্ছে, এর গুণাগুণ ততটা যে নয় তা তো সকলেই বুঝতে পারছেন। তারপরও আমাদের

www.pathagar.com

নীতিনির্ধারকগণ এটিকে শুধু আঁকড়ে ধরে আছেন তাই নয়,বরং নতুন নতুন শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করে এটিকে আরো জোরদার করছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি করে ফেলেছেন দেশের হাজারের অধিক স্নাতক কলেজকে, এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষাকেও। বলা মুশকিল কোন্ সে শিক্ষা-পরিকল্পনা থেকে দেশে এতসব শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কেউ কি তা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন? আগামী ১০/১৫ বছর পর পৃথিবীতে যখন শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষাপদ্ধতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হবে, তখন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হয়তো স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানে বড়ধরনের ভূমিকা রাখবে; তখন আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এ-ধরনের বোর্ড, অধিদপ্তরের অধীন কীভাবে পরিচালিত হবে তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

সবাই আমরা জানি, এসব শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষা অধিদপ্তর হচ্ছে এক-একটি দুর্নীতির আখড়া, শিক্ষাদীক্ষার চিন্তাভাবনার চেয়ে আমলাতন্ত্রের খড়্গ ঘুরানোই এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব বোর্ড অধিদপ্তর-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হয়ে আরো বেশি বেশি শিক্ষার মূলচেতনা থেকে ছিটকে পড়ছে। এগুলো কার্যত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব, সংস্কৃতি ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠা করে চলছে। ছাত্রছাত্রীরা সে-কারণেই বঞ্চিত হচ্ছে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করা থেকে। আজকে যখন বলা হয় যে, আমাদের ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬ লাখই অকৃতকার্য হয়েছে এসএসসি পাসে, তখন ভাবা হচ্ছে না এটি এদেশটির জন্য কতবড় অপচয়, কতবড় ক্ষতি হয়ে গেছে। কেন একটি দেশের এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুলপাসের এই পরীক্ষায় পাস করতে পারছে না? ঘাটতি ও গলদটা কোথায় তা খোঁজা হচ্ছে না। অথচ দিব্যি দেখা যাচ্ছে যে, দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মানসম্মত শিক্ষা দিতে পারছে না। এই না-পারার দায়ভারটা কার—সেটি খুঁজে দেখা উচিত সর্বাগ্রে। কিন্তু কোথায় সেই উদ্যোগ ও ভাবনাচিন্তা?

দেশের সিংহভাগ শিশুই কোনোপ্রকার পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। অর্থাৎ তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন ছয়বছরের শিশু প্রাথমিক স্কুলে অক্ষরজ্ঞান নিয়ে ভর্তি না হলে প্রথমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক আত্মস্থ করা তার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে ওইসব শিশুকে প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শহরাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেসরকারি কেজি স্কুলের সাহায্য নিয়ে থাকে। এটি শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের পক্ষে সম্ভব হলেও গ্রামের অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই এত অর্থ শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

আর শিক্ষাজীবনের শুরুতে শহর ও গ্রামের শিশুদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যে ব্যবধান সৃষ্ট হয়, তা পরবর্তী শিক্ষাস্তরে পূরণ করা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ শিশুই নিচের ক্লাস থেকেই বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কসহ পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ পাঠ প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হয়। স্কুলগুলোতে ছাত্র-শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত অনুপাত মোটেও মানা হয় না। শিক্ষকদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতবেশি ছাত্রছাত্রীকে ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রাথমিক স্তরে প্রকটতর হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এদেশে কোনোকালেই সিরিয়াসলি নেওয়া হয়নি। ফলে শিশু-মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব কোন্ পর্যায়ে আছে তা ভাবাই যায় না। শিশুদের শ্রেণীপাঠের উপযোগী জ্ঞান ও পাঠদানে প্রস্তুত করার বিষয়টিকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। অথচ আমাদের দেশে খুব কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেশের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই শুরু থেকে ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত পাঠ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে গড়ে তুলতে পারছে না। এগুলোতে হয় অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নেই, নতুবা প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষক নেই। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এখন ঘুস, দুর্নীতি ও দলীয় রাজনীতির হাতে সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে। মেধাবীরা এগুলোতে প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারে না। সুতরাং, তাদের চাকরি শিক্ষাক্ষেত্রে হবে তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে। তাছাড়া প্রকৃত মেধাবীদের আকৃষ্ট করার মতো বেতন ও সুযোগসুবিধা শিক্ষকতার পেশায় এমনিতেই নেই। অতএব, তারা কেন এই পেশায় আসবেন? দেশে এখন এমন কিছু বেসরকারি পেশা রয়েছে, যেগুলোতে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতিযোগিতায় মেধাবীদেরই স্থান শীর্ষে থাকে, চাকরি তাদেরই সেইসব প্রতিষ্ঠানে জোটে; যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। এছাড়া মেধাবীরা সরকারি উচ্চপদেও চাকরি পেতে পারেন। বেসরকারি কিংবা সরকারি উচ্চতর পদের চাকরিতে সুযোগসুবিধা এবং মানসম্মান স্কুল-শিক্ষকতার চেয়ে ঢের বেশি। এসব কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতার চাকরিতে অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা খুব-একটা আগ্রহী হচ্ছে না। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এখন তাই মেধাবী শিক্ষকের অভাব প্রকটতর হচ্ছে। এটি দিনদিন বাড়ছে। ফলে মানসম্মত শিক্ষার সংকট বাংলাদেশে গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

একটু মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশেরই মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার ওপর দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত মানে নেই। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি দক্ষ বাংলাভাষাবিষয়ক শিক্ষকের অভাবের কারণে ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দের ভাণ্ডার তৈরি

www.pathagar.com

করতে হয়, শব্দের প্রয়োগবিধি শেখাতে হয়। এর কোনোটিই আমাদের পাঠ্যপুস্তক এবং স্কুল-শিক্ষকদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত মানে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে মুখস্থবিদ্যাকে যতখানি প্রাধান্য বা গুরুত্ব দেওয়া হয়, ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব সৃজনশীল রচনা ও বাচনভঙ্গি সৃষ্টির বিষয়টিকে ততখানিই উপেক্ষা কিংবা নিরুৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই গতানুগতিক উত্তরদানে বা মুখস্থ করার বাইরে তেমন কিছু লিখতে বা বলতে পারে না। তাদের সেভাবে আসলে তৈরিই করা হয় না।

বিদেশী হিসেবে ইংরেজিভাষা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ওপর একটি বড়ধরনের পাথরের মতো চেপে বসেছে। অথচ শিশুদের যদি নিয়ম মোতাবেক ভাষা শেখানো হয়, তাহলে তারা যত দ্রুত তা শিখতে পারে বয়স্কদের পক্ষে তা মোটেও সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের স্কুলপর্যায়ে ইংরেজিভাষা না-শিখিয়ে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ইংরেজি রচনা, প্যারাগ্রাফ, চিঠিপত্র ইত্যাদি অনেক কিছু পরীক্ষায় আদায় করতে চাই, যা তারা মূলত বই থেকে মুখস্থ করেই লিখতে বাধ্য হয়—তাই ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিভাষা শেখানো হয় না। এসব ছাত্রছাত্রী ইংরেজি পরীক্ষা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই ভীতিসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে-কারণে তারা পরীক্ষার সময় বেপরোয়া হয়ে ওঠে নকলের জন্য। নকল না-করতে পারলে তাদের বেশিরভাগই ইংরেজিবিষয়ে অকৃতকার্য হয়। অথচ দক্ষ ইংরেজিশিক্ষক বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই—এটি বাস্তব সত্য।

অঙ্কবিষয়ে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এরও অন্যতম কারণ হচ্ছে, নিচের ক্লাস থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্ক ও গণিতের মর্মবস্তু, মৌলিক যুক্তিসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা গণিতের স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অঙ্কবিষয়টিও তাদের মধ্যে বড়ধরনের ভীতির সৃষ্টি করছে। সে-কারণে দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী না-হওয়ার ফলে বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো বিভাগে পড়তে পারছে না, তাদের আশ্রয় নিতে হয় মানবিক শাখায়। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এই শাখার লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে সহজ। বাংলাদেশে আমরা মানবিক শাখাকে ইচ্ছেমতো ভেঙে তছনছ করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাসের কথা বিবেচনা করে কিছু কিছু সহজ বিষয় প্রবর্তন করেছি, ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করছি ঐসব বিষয় নিয়ে সহজে এক-একটি সার্টিফিকেট লাভ করতে। জ্ঞানের জগৎটাকে নিয়ে এমন হেলাফেলা-খেলাখেলা ভাব পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে করা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। আসলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাষাজ্ঞান, অঙ্ক-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের জটিল জ্ঞানসহ শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় শাখার বিশেষ ও সমন্বিত কোনো জ্ঞানচর্চাতেই ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে না, করানো যাচ্ছে না। পাঠ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি, দুর্বলতা, শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও

www.pathagar.com

পাঠদানের দক্ষতার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণ এর জন্য দায়ী।

শিক্ষা একজন শিশুকে চমৎকার ভাষাজ্ঞান, বুদ্ধি, জ্ঞানদীপ্ত, বিষয়জ্ঞান, যুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি উচ্চতর গুণে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এর জন্য শিক্ষার মানসম্মত উপকরণ সর্বক্ষেত্রে থাকতেই হবে। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাক্রম, দক্ষ শিক্ষক, বিদ্যালয়ের পরিবেশ—কোনোটারই অভাব এমনি-এমনি পূরণ হওয়ার নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এসবের প্রায় কিছুই নেই। সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বেশিরভাগই রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; বদ্ধ বাতাস এগুলোর পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। এখানে ঢুকে বেশিরভাগ শিশু ছাত্রছাত্রীই প্রকৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কেমন করে বের হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং যে বিপর্যয় পাবলিক পরীক্ষায় ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তাকে কোনো অবস্থাতেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো উপায় নেই। বরং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সংকটের মধ্যদিয়ে চলছে। কোনো অভিন্ন গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতিতে এটি চলছে না এবং চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিরাজমান সংকট প্রকটতর হচ্ছে। আসলে বিপর্যয়টি ঘটে আছে দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাতে। পাবলিক পরীক্ষায় এর কিছু প্রতিফলন ঘটছে মাত্র, দেখা যাচ্ছে মাত্র। সুতরাং সেখানেই হাত দিতে হবে, কিছু একটা করতে হবে—তবেই এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে না দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

www.pathagar.com

শোনো হে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিকৃতকারীগণ শোনো

আমাদের স্কুলপাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত, মনগড়া ও বানানো উদ্ভট তথ্যে লেখা হয়েছে, হচ্ছে—এই অভিযোগ অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে গত তিনবছর ধরে অবিরত বেশি-বেশি শুনে আসছি। এ নিয়ে পত্রপত্রিকাগুলো যতখানি সোচ্চার; দেশের রাজনীতিক, শিক্ষক-ছাত্র ও সুধীমহল মনে হচ্ছে ততখানি নয়। তবে তারা এ নিয়ে কমবেশি উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধও। কিন্তু দেশে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাও যাচ্ছে না। ব্যাপারটি এমন হচ্ছে যে, তোমাদের কথা তোমরা বলো, আমাদের আবার আটকায় কে? তা না হলে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস নিয়ে এতসব বাদ-প্রতিবাদ, অভিযোগ, সমালোচনার পরও পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসবিকৃতি রোধের সামান্যতম উদ্যোগ নেই; অধিকন্তু নতুন নতুন আদেশ-নির্দেশে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশকে আরো বেশি করে বিকৃত করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধকে সামরিক যুদ্ধের চরিত্র দান করা হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দোষারোপ করা হচ্ছে। জাতিকে নেতৃত্বদানে তারা যখন ব্যর্থ হয়েছিলেন "দিশেহারা জাতিকে তখন উদ্ধার করেছিলেন একমাত্র জিয়াউর রহমানই।"—মুক্তিযুদ্ধের এমন উদ্ভট কল্পকাহিনী লেখা হয়েছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে। এ নিয়ে দেশে মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিতভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। তবে ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলে কখনো কখনো হতাশ হই, দুঃখ পাই, আবার মাঝে মাঝে বেশ আশাবাদীও হয়ে উঠি।

হতাশ হওয়ার কথা দিয়েই শুরু করি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, দেখেছেন, অনেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাতে অংশগ্রহণও করেছেন—তাদের মধ্যে অনেককেই দেখছি মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন ঘটনাবলি সম্পর্কে এখন এমন সব কথা বলতে, নিজের 'আমিত্ব'কে অনেকে বড় করে দেখাচ্ছেন অথবা তাদের এখনকার রাজনৈতিক দলের অবস্থান ও বিশ্বাস থেকে এমনভাবে বলছেন, উপস্থাপন করছেন, যা ১৯৭১ সালের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ১৯৭১ সালে 'চার খলিফা' বলে খ্যাতদের একজন ছিলেন শাজহান সিরাজ। তখন তিনি

www.pathagar.com

ছাত্রনেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর হঠাৎ করে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী হয়ে গেলেন। ১৯৭৫ সালের পরও তিনি সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের কঠোর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর আগে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ ত্যাগ করে রাতারাতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছেন। এখন তিনি জোটসরকারের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে একসঙ্গে বসেন, সরকারের কাজ করেন। কিছুদিন আগে চ্যানেল আই-এর 'তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানের এক আলোচনায় তিনি ১৯৭১ সালে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা শুনে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কথা বলার পর নিজের কানকে অনেকক্ষণ বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অথচ ১৯৭১ সালে তিনিসহ অন্য 'তিন খলিফা' ভারতে অবস্থানকালে যেসব বক্তৃতা করেছেন; স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, তৎকালীন পত্রপত্রিকায় তাদের ভাষণের যেসব অংশ প্রকাশিত হয়েছে—তাতে কোথাও জিয়াউর রহমানের কথা উল্লেখ নেই, শুনেছি বলে মনে পড়ে না, তৎকালীন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাতেও তেমন কিছু দেখছি না; বরং তখন তাদের বাক্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকবার বঙ্গবন্ধুর নামই উচ্চারণ করতে শুনেছি। এ-ধরনের শাজাহান সিরাজ বাংলাদেশে এখন একজন নয়, হাজার হাজার বললেও মনে হয় কম বলা হবে। দুঃখটা তাদের দল পরিবর্তনের জন্য নয়। দুঃখটা হচ্ছে তারা তাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান থেকে ১৯৭১ সালকে যাচ্ছেতাইভাবে, যা তারা তখন করেননি, ভাবেননি—তা অবলীলায় বলছেন; তখন তারা যা দেখেছেন বা করেছেন সেটিকে এখন জলজ্যান্তভাবে অস্বীকার করছেন, স্রেফ মিথ্যাকথা বলে যাচ্ছেন। ১৯৭১ সালে তিনি যেহেতু অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখন তিনি যা-খুশি তা বলেছেন। তার বলা কথাকেই ইতিহাসের একমাত্র 'সত্য' বলে আমাদেরকে ভাবতে হবে, ধরে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে—এমনই ভাবখানা দেখাচ্ছেন।

প্রায়ই বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে রাজনৈতিক দলের অনেক নেতার আলোচনা শুনে একই রকম ধারণা পেয়েছি, পাচ্ছি। সম্প্রতি পিএইচডি করেছেন এমন একজন রাজনৈতিক নেতা হচ্ছেন সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমদ। তাঁর পিএইচডি নিয়ে আমার কোনো কথা নেই, সেটি প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁকেও দেখলাম এমনি একটি অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের একক কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকে যেভাবে দিচ্ছিলেন, তা যদি সত্যিই তাঁর বিশ্বাসের কথা হয় তা হলে আমার আর বলার কীইবা থাকতে পারে! তবে তথ্যপ্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণকে বাদ দিয়ে তিনিও যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল বিদ্যা, শিক্ষা, গবেষণা বোধহয় এ জাতির জন্য বড়ই অপ্রয়োজনীয়, কাগজসর্বস্ব; ডক্টরেট ডিগ্রিটাও নেহাত নামের অর্জনটা সমাজে বৃদ্ধি করার জন্য।

www.pathagar.com

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজে এখন বিস্ময়করভাবে হলেও অতি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক আছেন—যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সত্যকে এককথায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এখন মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় জীবনের অনেক কিছু সম্পর্কে যুক্তিহীন, তথ্যহীন, জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন মন্তব্য করে বেড়াচ্ছেন, পত্রপত্রিকায় কেউ কেউ 'কলাম'ও লিখছেন। পাঠ্যপুস্তকে তাদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস লেখায় হাত দিয়েছেন। এককালের চৈনিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী কারো কারো আলোচনা শুনে, লেখা পড়ে মনে হয় বাংলাদেশটা তাদের নেতা মওলানা ভাসানীই স্বাধীন করে দিয়েছেন। মওলানা ভাসানীর অবদানকে খাটো করার কথা বলছি না। কিন্তু কিছুতেই শেখ মুজিবকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা মানতে তারা রাজি নন। সেদিন কাজী জাফরের এমন একটি আলোচনা শুনেছি চ্যানেল আই-এর 'তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানে। কাজী জাফরের আলোচনা শুনে মনে হচ্ছিল তিনি, আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ আরো কয়েকজন চৈনিক আদর্শে বিশ্বাসী নেতাই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন। শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি—এটি তিনি 'দ্ব্যর্থহীন' ভাষায় বললেন। এভাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে যখন কাজী জাফরদের মতো নেতারা বলেন, তখন বুঝতে খুব বেশি বাকি থাকে না যে এরা অন্যের অবদানকে স্বীকার করতে রাজি নন। এটিকে তাদের ঈর্ষাপরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতার মনোভাব বলে সবাই অভিহিত করে থাকেন।

এতবড় একটি মুক্তিযুদ্ধকে আসলে বোঝা, বিশ্লেষণ করা, পরিমাপ করার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চা, পদ্ধতিগত তত্ত্ব, সততা, সংস্কৃতির দারুণ অভাব আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন, শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে রয়েছে। অথচ নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা মোটেও সচেতন নই, সৎও নই। জীবনে কখন কয়েকখানি গুরুগম্ভীর বই পড়েছি, একটা-দুটা শিক্ষাগত ডিগ্রি অর্জন করেছি—আর ভাবখানা দেখাচ্ছি যে আমি দেশ জাতির ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সবকিছু সম্পর্কে জানার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে পড়েছি। বিনয় বলে একটি সংস্কৃতি ও আচরণ সভ্যতার ইতিহাসে আছে—সেটির দারুণ অভাব নিজদেশ বাংলাদেশে দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত হই, দুঃখ পাই, লজ্জা পাই, হতাশায় নিমজ্জিতও হই। দেশের রাজনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে এতসব নেতিবাচক প্রবণতার বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখে হতাশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মিথ্যার বেসাতির এমন নগ্নরূপ আমার জানামতে সভ্য দুনিয়ায় কল্পনা করা যায় না। তারপরও আমরা কিছুটা হলেও আশাবাদী যে একদিন আমাদের সমাজের এসব 'শক্তিমান' মানুষগুলো শক্তিহীন হয়ে পড়বেন, মানুষ সত্যিকার মানুষদেরই চিনে নেবে, বেছে নেবে। এখনই সমাজে রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন দেশের নামীদামিদেরও ভাবমূর্তির সংকট শুরু হয়ে গেছে। মিথ্যাবাদী মানুষদের সাধারণ

www.pathagar.com

জনগণ এখন মনে-মনে অপছন্দ করতে শুরু করছে, ঘৃণাও করছেন অনেকে। এই প্রক্রিয়া একদিন জোরদার হবে, প্রতিষ্ঠা পাবে—এমনটি বিশ্বাস করতে পারি। সুতরাং যারা এখন পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের মিথ্যা ইতিহাস লিখছেন, সভা-সমাবেশ, আলোচনায় মিথ্যাকথা বলছেন, মনগড়া তথ্য দিচ্ছেন, নিজেদের বলা কথাকেই ইতিহাসের 'শাশ্বত সত্য' বলে মনে করছেন—তাদের ভাবমূর্তির সংকট ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সব মানুষকে বোকা মনে করার কোনো কারণ নেই। শিশুদের অজ্ঞ, মূর্খ ভাববারও কোনো কারণ নেই। বরং যারা তা ভাবেন তারাই আসল মূর্খ, অজ্ঞ—একথা তাদের এখন জানতে হবে।

দেশে অনেক বছর ধরেই তো মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। স্কুলের ১৮টি বইতে এখন স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম ঘুরে-ঘুরে লেখানো হয়েছে। শিশুরা এ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে সত্য। তবে সরকারি টিভি নয়, বরং দেশী-বিদেশী বেসরকারি বেতার-টিভি, বই-পুস্তক ইত্যাদির কল্যাণে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই জানতে পারছে স্কুলের পাঠ্যবইতে তারা যা পড়ছে তা ঠিক নয়, মিথ্যা ইতিহাস। অধিকাংশ স্কুল-ছাত্রছাত্রীই জানে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণাদাতা, মূল নেতা; তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি তাদেরকে অনেককিছু জানিয়ে দেয়,শিখিয়ে দেয়, ভাবতে শেখায়। সুতরাং যতই পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে জিয়াউর রহমানকে এনে স্বাধীনতার ঘোষণার সিংহাসনে বসানো হোক না কেন; ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, চলেছে, শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামেই। প্রতিদিনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার যে বজ্রকণ্ঠটি শোনা যেত সেটিই মানুষকে মানসিকভাবে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের দিকে নিয়ে গেছে। এই সত্যটি আমাদের অর্ধশিক্ষিত কিছু লোক—যারা স্কুলপাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত তথ্যে লিখেছেন, লেখার কাজে সেবাদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তারা বোঝেন না। বোঝার মতো পাণ্ডিত্য, সততা, মেধা, লেখাপড়া, ইতিহাস জ্ঞান তাদের নেই। থাকলে তারা এমন মিথ্যার বেসাতিতে যোগদান করতেন না। তাদের জ্ঞাতার্থে আমি কিছুদিন আগে আমার শোনা একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনাটি শুনে যদি তারা লজ্জিত হন, তাদের যদি কোনো বোধোদয় ও শিক্ষা হয়, তাহলে ভালো কথা। তবে তা না হলেও দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। অন্যরা নিশ্চয়ই ঘটনাটি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন। তাদের জন্যই আমার এই অবতারণা।

কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজে নোয়াখালীর একটি কলেজে আমাকে যেতে হয়েছে। সেখানে বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিকৃতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা

www.pathagar.com

হচ্ছিল। গ্রামের একজন ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে ঘটনাটির কথা বললেন। তার মেয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে আয়োজিত বৃত্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। বৃত্তি-পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক একটি প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে? দুটো উত্তরে শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমানের নাম লেখা ছিল। ৪র্থ শ্রেণীর উক্ত ছাত্রীটি শেখ মুজিবের নাম উত্তরপত্রে লেখায় একজন হল-পরিদর্শক তাকে বলল, 'তুই যে-উত্তরটি লিখেছিস তাতে তো তুই নম্বর পাবি না।' ছাত্রীটি কোনোপ্রকার দ্বিধা না করেই বলে ফেলল, 'মিথ্যাকথা লিখে আমার নম্বর পেতে হবে না। আমি তেমন বৃত্তি পেতেও চাই না।' আমি একজন অভিভাবকের মুখ থেকে তার মেয়ের এমন উত্তর শুনে অভিভাবকেই জড়িয়ে ধরে বলেছি, 'যদি হাতে সময় থাকত তাহলে আমি আপনার মেয়েটিকে একটু হলেও দেখতে যেতাম। তবে আপনার মেয়ের কথা শুনে আমি এতটাই উজ্জীবিত হয়েছি যে, ওকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলেও কল্পনায় আমি আপনার মেয়ের ছবি এঁকে নিচ্ছি—যারা আমাদেরকে, বড়দেরকে, শিক্ষক,রাজনীতিবিদদের লজ্জা দিতে পারবে।' আমি জানি না, যারা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের এমন সব মিথ্যাকথা লিখে পর্দার আড়ালে বসে বসে মনের সুখে জাবর কাটছেন আর ভাবছেন যে—ব্যাটা শেখ মুজিব তোকে ইতিহাসের পাতা থেকে কীভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি, জাতির জনক হওয়ার তোর বড় শখ হয়েছে, দ্যাখ্ ব্যাটা এখন তুই কোথায়, আমরা বেঁচে থাকতে, ক্ষমতায় থাকতে তোর আর ইতিহাসে ঠাঁই নেই, স্থান নেই—তাদের মনে হয় না এই ঘটনা শোনার পর কোনো বোধোদয় হবে, লজ্জা হবে।

তবে বাংলাদেশের অনেক স্থানেই আমার যাওয়া-আসা আছে। স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গেই আমার দেখা হয়, কথা হয়, পরিচয় হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদের বেশিরভাগই জানে যে, তাদের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের অংশে সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা লেখা হয়েছে। তারা পারতপক্ষে ঐ অংশের কোনো উত্তর পরীক্ষায় লেখে না। কেননা, মিথ্যাকথা লিখতে তাদের কলমে বাধে। অথচ আমাদের কিছু সেবাদাস লেখক আছেন (তাদের আমি ইতিহাসবিদ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না) যারা অন্ধবিশ্বাস, হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা, কিংবা অর্থের জন্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের মিথ্যা ইতিহাস লিখেছেন। তাদের বিবেক ও কলম দুটোই আসলে নষ্টভ্রষ্ট।

হ্যাঁ, নতুন একটি প্রজন্ম এই দেশেই সৃষ্টি হচ্ছে নীরবে। সম্পূর্ণ নতুন রক্ত, নতুন চিন্তা, সৎ ও বিবেক দ্বারা এরা গঠিত হচ্ছে। এরা একদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আর কোনো মিথ্যাচারে লিপ্ত হবে না, টানাটানিতে জড়াবে না। মেধা, মনন, সততা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে তারা নিষ্কলুষই হবে, থাকবে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের শৌর্যবীর্যের সেই মহৎ ইতিহাস একদিন

www.pathagar.com

রচিত হবেই। তবে তা মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম হিসেবে আমরা লিখে যেতে পারিনি—এখানেই আমার লজ্জা, দুঃখ এবং অনুশোচনার কারণ। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম যখন সকলপ্রকার স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লিখবে তখন বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ করে শিশুরা আবেগে আপ্লুত হয়ে ফিরে পেতে চাইবে মহান ১৯৭১ সালকে—যেখানে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু, তাঁর সহকর্মী, লক্ষ কোটি মানুষ, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা, যোদ্ধা,নারী-পুরুষকে দেখবে যার যার উজ্জ্বল অবস্থানে। সেই ইতিহাসে সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানের নামও থাকবে—যিনি বঙ্গবন্ধু এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। ইতিহাস এভাবেই মানুষকে বাঁচতে শেখায়। আমি ইতিহাসের সেই সামান্য জ্ঞানসাধনায় ব্যস্ত ও বিশ্বাসী একজন ছাত্র মাত্র।

১৬ জানুয়ারি ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা : গলদ নিরসনের উপায় কী?

যে-কোনো পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় সাধারণত দুটো চিত্র দেখা যায়। এক. কিছুসংখ্যক কৃতী ছাত্রছাত্রীর মাতাপিতা-সমেত হাস্যোজ্জ্বল ছবি ও তাদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। দুই. ফলাফল বিপর্যয়ের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিতকরণ, হিসাব-নিকাশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ফলাফলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, পত্রপত্রিকাগুলো কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মুখ থেকে কিছু কিছু কথা বের করতে চায়, যার উত্তর দিতে তারা আমার কাছে মনে হয়েছে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। যেমন, তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে? এ-ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অধিকাংশ কৃতী ছাত্রছাত্রীই এখন আর খুব একটা রাজনৈতিক নেতাদের নাম উচ্চারণ করে না, সম্ভবত দলীয়ভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ের কারণে। এদের বেশিরভাগই এ-প্রশ্নের উত্তরে এখন হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নাম উচ্চারণ করে নিরাপদে থাকতে চাচ্ছে। হযরত মোহাম্মদ (স.) যে-কোনো মুসলমানের কাছে শুধু প্রিয় ব্যক্তিত্বের তালিকায় আসবেন কেন, ধর্ম আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনায় তাঁর আসন শ্রেষ্ঠ মহামানবের। একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে যেমন গৌতম বুদ্ধ, একজন খ্রিস্টানের কাছে যিশুখ্রিস্ট, অর্থাৎ সকল ধর্মাবলম্বীর কাছেই তাদের ধর্মের প্রবর্তকই সকলের শীর্ষে স্থান পাবেন—এটিই স্বাভাবিক। সাধারণত প্রিয় ব্যক্তিত্বের তালিকায় রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী-সাহিত্যিক বা সমপর্যায়ের পছন্দের এক বা একাধিক নামই জানতে চাওয়া হয়, এমনকি প্রায় সকলেরই একাধিক ব্যক্তিত্ব আছেন। কিন্তু আমাদের কৃতী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখন প্রিয় ব্যক্তিত্বের নাম উচ্চারণে মনে হয় ঐসব দিকের নাম বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। জানি না, এর অন্য কোনো কারণ আছে কিনা।

সে যাই হোক, সম্প্রতি আমাদের ৭টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এইচএসসিতে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাসের হার ৩৮.৪৩ উঠেছে বলে অধিকাংশ পত্রিকায় লেখা হয়েছে, নতুবা এই পাসের হার ৩০-এর নিচে নেমে যেত। শিক্ষামন্ত্রণালয় অবশ্য তা স্বীকার করতে চাইছে না। মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৩৯.৮৯, ফাজিল পরীক্ষায় ৪৮.৭০ ও কামিল পরীক্ষায় ৮৫.১০ জন। কারিগরি

www.pathagar.com

শিক্ষাবোর্ডের গড় পাসের হার ৬৩.৪৬ জন।

পত্রপত্রিকায় এ-পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়েই মূল্যায়ন চোখে পড়ছে বেশি। এর কারণও সঙ্গত। এখানে ৭টি শিক্ষাবোর্ডের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৯২ হাজার ৭১৩ জন। অকৃতকার্যের সংখ্যা ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৯৪ জন। দুটো পরিসংখ্যান পাশাপাশি রেখে দেখলে আঁতকে ওঠারই কথা। তাদের সবাই ২/৩ বছর আগে এসএসসি পাস করেই উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। এতবড় একটি পাবলিক পরীক্ষায় পাসের পর তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই যখন আর-একটি পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না তখন বিষয়টি নিয়ে খুব সাদামাটাভাবে কথা বলার অবকাশ থাকে কি? এরা তো ছেঁকে আসা ছাত্রছাত্রী। এসএসসিতে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত কোনো ছাত্র এইচএসসিতে 'এ' গ্রেড না-পেতে পারে, কিন্তু অকৃতকার্য হবে কেন? দেশের নামীদামি কলেজ, যেগুলোতে বেছে বেছে সব উচ্চগ্রেডের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানো হয় (আমি এ-ধরনের সুযোগ কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়ার পক্ষপাতী নই), তাদের ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি কীভাবে দেখা হচ্ছে—জানি না। আবার পাড়াগাঁয়েও কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফল তাদের কাছেই বিস্ময়করভাবে 'ভালো' হয়েছে বলেও শুনেছি। আমি কোনো হিসাবই মেলাতে পারছি না। কোনো ফলাফল নিয়েই আমার আসলে ক্ষোভ, উচ্ছ্বাস বা হতাশা তেমনটা নেই। কারণ আমার কাছে বরাবরই মনে হয়েছে আমরা পরীক্ষাকেন্দ্রিক লেখাপড়ায় শিক্ষামন্ত্রণালয়, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভাবতে, প্রস্তুতি নিতে ও অভ্যস্ত হতে দেখি। ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিকভাবে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করার মতো করে গড়ে তুলছি না। অনেক ফাঁকফোকরের মধ্যদিয়ে চলছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষামন্ত্রণালয়, পরীক্ষাপদ্ধতি, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকসমাজ। সে-কারণে একটি ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হলেও পরের ধাপে গিয়েই বড়ধরনের হোঁচট খাচ্ছে অনেকেই। এই যে ৬০ শতাংশের অধিক ছাত্রছাত্রী এইচএসসিতে অকৃতকার্য হয়েছে তারা তো এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিল। কেউ কেউ বেশ উপরের গ্রেডেই পাস করেছিল, কেউ কেউ একাধিকবার পরীক্ষা দিয়েও এইচএসসি পাস করতে পারছে না। আবার যারা এখন এইচএসসি পাস করছে তাদের বিরাট অংশই ডিগ্রি পাসকোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানেও ৩ বছর পর তাদের বড় অংশই অকৃতকার্য হবে।

দেখা যাচ্ছে, আমাদের কৃতী ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ যারা ভালো গ্রেড পাচ্ছে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের যথাস্থানে ধরে রাখতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যত্র ভর্তিপরীক্ষায় খুব একটা কৃতকার্য হতে পারছে না। আমরা আপাতদৃষ্টিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সীমিত দেখি। কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু বিভাগে প্রতি বছরই

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন খালি থাকে, ভর্তির জন্য নির্ধারিত নম্বর তারা লাভ করতে পারে না। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে বিষয়-নির্বাচনীতে সচরাচর এমন কিছু বিষয়কে বাছাই বা গ্রহণ করে থাকে যা তাদেরকে এইচএসসি পরীক্ষায় শুধুমাত্র অধিক নম্বর প্রাপ্তির সুযোগ এনে দেয়, কিন্তু পরবর্তী শিক্ষাজীবনে ঐ বিষয়ের কোনো গুরুত্বই কোথাও পাওয়া যায় না। এই ফাঁকফোকরগুলো উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের যেদিকে প্রলুব্ধ করে তাতে এইচএসসির ফলাফল অনেকটা স্ফীত হয় সত্য, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তিতে তাদের ধপাস পতন ঘটায় মাত্র। তারা তখন অবিশ্বাস্য ভালো ফল নিয়ে গ্রামের কোনো ডিগ্রি কলেজে পাসকোর্সে ভর্তি হতে ছোটে। এই প্রবণতার সংখ্যাটি একেবারেই কম নয়।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানবিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত ভালো। দেখা যাচ্ছে, এই পর্যায়ে পদার্থ ও রসায়ন বিষয়কে আবশ্যিক রেখে গণিত, জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ইত্যাদি হরেক রকম বিষয়কে ঐচ্ছিকের তালিকায় রাখার ফলে ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশই বিষয়-নির্বাচনে এগুলোকেই পছন্দ করে থাকে। এর ফলে পরীক্ষায় কৃত্রিম ফলাফলের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরবর্তী শিক্ষার স্তরেও ছাত্রছাত্রীদের নানাধরনের বিপর্যয়েরও সম্মুখীন হতে হয়। একইভাবে ব্যবসাবাণিজ্য গ্রুপে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়কে আবশ্যিক রেখে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অনেক বিষয়কে রাখার ফলে বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষার স্তরে এগুলো তেমন কাজে লাগে না কিংবা বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থনীতি বিষয়টি ইতিপূর্বে পড়ে না-আসার ফলে দারুণ ভোগান্তিতে পড়তে হয়। সুতরাং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারার ক্ষেত্রে বড়ধরনের সমস্যায় পড়ে। মানবিক বিভাগের কথা এখন বলতে খুব লজ্জা ও কষ্ট হয়। মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক বলে কোনো বিষয় নেই। তারা কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে প্রলুব্ধ হয় বেশি-নম্বর-পাওয়া বিষয়-নির্বাচনে। শিক্ষকরা ছাত্র 'শিকার' করছে নিজেদের বিষয় ও চাকরি রক্ষার জন্য, এমন অভিযোগ বিস্ময়কর হলেও অনেক ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটছে আমাদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায়। মানবিক বিভাগে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় সত্য, কিন্তু তাদের বিষয়-নির্বাচনের তালিকায় এখন অর্থনীতি, ইতিহাস, পৌরনীতি, সমাজতত্ত্ব বাদ পড়ে গেছে। বেশিরভাগ কলেজেই এখন এসব বিষয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের পাচ্ছেন না।

আসলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এভাবে বিষয় নির্বাচনের কোনো তালিকাই দেওয়া উচিত নয়। এটি পরবর্তী শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য বড়ধরনের সমস্যা তৈরি করে। একজন অর্থনীতি বিষয়ের ছাত্র ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও

www.pathagar.com

সাহিত্যের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ধারণা না-রাখলে তার পক্ষে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স পড়া খুব সহজ হওয়ার কথা নয়। একই অবস্থা তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয় না-পড়েও যদি কেউ বিএসসি পাস সনদপত্র পেয়ে থাকে তাহলে দেশে স্কুলপর্যায়ে গণিত বা বিজ্ঞানবিষয়ের দক্ষ শিক্ষক পাওয়া যাবে কীভাবে? এর পরিণতি আমরা ইতোমধ্যে ভোগ করতে শুরু করছি। গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় আসলেই আমাদের উচ্চমাধ্যমিক এই দুই বছরের শিক্ষার উদ্দেশ্য, ধরন-ধারণ তো স্কুলশিক্ষার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আবার উচ্চশিক্ষারও কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারছে না। স্কুলশিক্ষা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে কলেজে নেওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো স্কুল একে ধরে রেখে 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ' নাম ধারণ করছে। একইভাবে বেশকিছু ডিগ্রি অনার্স ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ উচ্চমাধ্যমিক স্তর ত্যাগ করেছে। সরকারি আদেশেই এমনটি হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা এর ফলে পড়ছে বড়ধরনের বিপাকে। তাদেরকে হাতছানি দিচ্ছে বড় কলেজ নামক প্রতিষ্ঠান—যেখানে বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ছাত্রছাত্রীদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, বেশ রোমান্টিক জীবন কাটাতে দেখা যায়। বিষয়-নির্বাচনের গোলকধাঁধায় এরা হয় বিভ্রান্ত, অনেকটা দিকভ্রান্তও বটে। আবার কোনো কোনো স্কুলে এদেরকে ধরে রাখা হয় নিজেদের ক্যাম্পাস বলে। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা খারাপ সেই তুলনায় আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এমনটি হবে কেন? আমরা কি পৃথিবীটা একটু খোলা চোখ দিয়ে দেখতে পারছি না? আমাদের বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার সমস্যাগুলো একটুও যাচাই-বাছাই করে দেখতে আমরা কি অক্ষম?

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে না রাখলাম স্কুলশিক্ষার সঙ্গে, না করলাম একে উচ্চশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে দেশের কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী এই পর্যায়ে এসে জীবনের দুটো বছর কী পড়ে, কী শেখে, এই লেখাপড়ার উপযোগিতা কী—হিসাব মেলালে একটা মস্তবড় প্রশ্নবোধক চিহ্নই শুধু খুঁজে পাই না, বড়ধরনের ধ্বংসের মুখোমুখিও তাদের হতে দেখি। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যাদের শিক্ষাজীবনটাই আমার বিবেচনায় বিড়ম্বনায় ভরপুর, একদেশদর্শী; অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞানে এদের বড় অংশই সমাজের তথাকথিত উচ্চডিগ্রিধারী ব্যক্তি হন মাত্র, উচ্চশিক্ষিত হতে পারেন কমজনই। সে-কারণে আমার বক্তব্য হচ্ছে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ করতেই হবে। সেভাবেই ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে যেখানে আবশ্যকীয় শিক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয়ের ফাঁকফোকর কারো জন্য থাকবে না। বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখাতেই পরবর্তী শিক্ষাজীবনের যে-কোনো ছাত্রছাত্রীর যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা যেমন থাকবে না, তেমনি বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় ও জ্ঞানসমূহের ধারণা পাওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করাও ঠিক হবে না। একইভাবে বাণিজ্য বা মানবিক যে-কোনো শাখায় উচ্চতর শিক্ষালাভ

www.pathagar.com

যথাক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে মৌলিক আবশ্যকীয় ধারণা লাভ ব্যতীত কোনো ছাত্র যাতে পার পেতে না পারে সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ-ধরনের ঘাটতি নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে কেউ লেখাপড়া করতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, সে-ধরনের দুর্বলতা আমাদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিশেষভাবে রাখা হয়েছে।

কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাস্তবতা-বিবর্জিত আবেগ, সস্তা-জনপ্রিয়তা লাভ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির বিষয়গুলোকে একেবারেই পরিহার করা উচিত। এখন দেশে কয়েক হাজার মাদ্রাসা আছে যেগুলোতে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, কয়েকশো কলেজ আছে যেগুলো প্রতিবছরই ছাত্রের জন্য হাহাকার করছে। কোনো অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নেই, দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বেতনভাতা নেই এবং এগুলোর কোনোটিই প্রত্যাশিত মানের ধারেকাছে নেই। আবার অভিজাত কলেজগুলো চলছে অতীত নামধামে। ঢাকা শহরের নামীদামি কলেজসমূহের শিক্ষক এখন কারা, কী তাদের পরিচয়, তাদের ক্লাস পারফরমেন্স কী! অথচ ঐসব কলেজে একসময় এমন সব শিক্ষক ছিলেন যাদের নাম, ক্লাস পারফরমেন্সের কথা দীর্ঘদিন লোকমুখে প্রচারিত হত। আমি কারো প্রতি অসম্মান দেখাতে চাই না। তবে একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য, শিক্ষিত মেধাবী প্রজন্ম তৈরির জন্য আমাদের স্কুল, মাদ্রাসা-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-পর্বের কোনো শিক্ষাই যুগের উপযোগী হওয়ার ধারেকাছেও নেই—এ ব্যাপারে আমার অভিমত দ্বিধাহীন। উচ্চমাধ্যমিক কলেজ শিক্ষার অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা'। সুতরাং, ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয় এবং প্রতিবছর একটা সময়ে তাই দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিকৃতি এবং বিকৃত মানসিক ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি

বিজয়ের এই মাসে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বহুমুখী অর্জনের কথাই শুনব এমনটিই তো প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু আমাদের সেই ভাগ্য তেমন একটা অবশিষ্ট নেই। এখন মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক, প্রচারমাধ্যম, রাজনৈতিক অঙ্গন, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ এই দেশের সর্বত্র এতটাই প্রবল যে, মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস তাতে দাঁড়াতে পারছে না। এখন মুক্তিযুদ্ধে যার সামান্যতম আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই, অংশগ্রহণ ছিল না, সেই মানুষই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের 'সবক' দিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার 'উপদেশ' দিচ্ছে। সে-কারণেই এখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কে অসৎ রাজনীতি করছে, কে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে, কীভাবে করছে—এসব প্রসঙ্গে কথা বলা বেশ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিকৃতির ধরনধারণে কী পরিমাণ শঠতা, জোচ্চুরি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মানসিকত্যর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে সে-সম্পর্কে আমরা কমই খোঁজখবর রাখছি। এ-কাজে শিক্ষক ও সাংবাদিক পেশার কিছু মানুষ এমনভাবে যুক্ত হয়েছেন যাদের ইতিহাস-জ্ঞানের দৈন্যদশা দেখে অবাক হতে হয়, বিস্মিত হতে হয়। অথচ এরা কেউ কেউ 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা'য় এখন বিএনপি-জামাত জোটসরকারের দিকপালের 'মর্যাদা' লাভ করেছেন। স্কুলপাঠ্যপুস্তকে তারা মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী-মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দৃশ্যপট থেকে হটিয়ে দিয়েছেন; তাদের সকলের সেইদিনের আসনে কোনোপ্রকার ভূমিকা ও পটভূমি ছাড়া বসিয়েছেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে। বাংলাদেশের নয় মাসের বিশাল, জটিল এই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধকে মেজর জিয়াউর রহমানের একটি বেতার-ঘোষণার জাদুকরি মন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে তুলে ফেলা হয়েছে, যেন এটি আর তেমন কী ঘটনা! বিশেষত যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে, তাদের তো লিখিত বইপুস্তক, বেতার-টিভির প্রচার এবং ১৯৭১ সালে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে জানার সুযোগ নেই।

দেশের পাঠ্যপুস্তকসমূহে ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের পর থেকে সমাজবিজ্ঞান, মাধ্যমিক ইতিহাস বইগুলোতে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' পর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান ও মেজর জিয়ার প্রচারিত ঘোষণার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায়। তবে তখনো বিষয়টি ছিল বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এবং প্রথমজনের ঘোষণার তারিখ ২৬ মার্চ, দ্বিতীয় জন অর্থাৎ মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় তারিখটি ছিল ২৭ মার্চ। যেহেতু জিয়াউর রহমান তখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই মেজর জিয়াউর রহমানের ১৯৭১ সালের ভূমিকাটি তখন একটু বেশি প্রাধান্য পায়। তবে সেই ভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রধান নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করা হয়নি এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার তারিখটিও অবিকৃত রাখা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাটি কেন যেন তখনো খুব-একটা গুরুত্ব পায়নি।

একসময় পঞ্চমশ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ্যপুস্তকে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' পর্বে ৩টি ছবি সন্নিবেশিত হয়েছিল। প্রথমটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের, দ্বিতীয়টি মেজর (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট) জিয়াউর রহমানের, সর্বশেষটি লে. কর্নেল এমএজি ওসমানীর। পাঠক লক্ষ্য করুন, ১৯৭১ সালের ইতিহাস উপস্থাপনায় ছবির এমন সন্নিবেশ বা মর্যাদাপ্রাপ্তিটি কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল? এই ধারাটি ১৯৯৬ সালের সংস্করণ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে বাদ দিয়ে এম এ জি ওসমানীর ছবির অবস্থানটিই যেখানে দৃষ্টিকটু এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, সেখানে জিয়াউর রহমানের ছবির অবস্থানটি কতখানি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থেকে করা হয়েছিল তা বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়। দীর্ঘদিন এই ছবি, ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার ঘোষণার বিষয়টি নীরবে অবস্থান করার ফলাফল হল এই যে, ঐ সময়ের শিশু-কিশোরদের মানসে জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিটি স্থায়ী হয়ে যায়। তাদের পক্ষে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধে কার কী ভূমিকা ছিল, সে-সম্পর্কে মতামত রাখা, বিচার করার কথা নয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিল যে, ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমানের ভূমিকা শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে তেমন বোধহয় কম নয়, কাছাকাছি তো হবেই এবং মেজর জিয়ার অবস্থান এমএজি ওসমানী বা তৎকালীন সরকারের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিল। তেমনটি না হলে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে তার ঘোষণার কথাই বা কেন এতখানি গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হল, কেনই বা তার ছবি ওসমানীরও আগে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা

www.pathagar.com

হল। স্কুলপর্যায়ে শিশু-কিশোরদের কাছে বিষয়টি এভাবে দুই দশকের অধিক সময় ধরে উপস্থাপিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে দীর্ঘসময় ধরে মুক্তিযুদ্ধের এমন উপস্থতি ও উপস্থাপনা শিশু-কিশোরদের মানসগঠন, বিশ্বাস তৈরিতে যে ভিত্তি তৈরি করেছিল তাকেই ২০০১ সালে জোটসরকার ক্ষমতায় আসার পর চূড়ান্ত করেছে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধের একক কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানের নামেই পাঠ্যপুস্তকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এখন মুক্তিযুদ্ধের সকল কৃতিত্ব তৎকালীন জিয়াউর রহমানের নামে লেখা হয়েছে। বলা হয়েছে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী যখন ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতে পালিয়ে যায় (রাতারাতি)। তারা কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, ভারতে পালিয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতির সম্মুখে সময়ের সাহসী সন্তান মেজর জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন। তিনি শুধু স্বাধীনতাই ঘোষণা করেননি, তিনি একটি অস্থায়ী সরকারও গঠন করেন, সেই সরকারের প্রধানও তিনিই ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত জেড-ফোর্সের প্রধান হিসেবে তিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এভাবেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

একথাগুলো চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এবং অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা' পাঠ্যপুস্তকে আরো বিস্তৃতভাবে আরো নগ্নভাবে লেখা হয়েছে। লিখেছেন বাংলাদেশেরই একজন সংবাদিক, দৈনিক দিনকালের সম্পাদক কাজী সিরাজউদ্দিন। গত ৩ বছর ধরে বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ের ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও নেতৃত্বের মূল নায়ক হিসেবে এভাবেই জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে আর কোনো দ্বিতীয় নেতা বা নেতৃত্বের ভূমিকাকে রাখা হয়নি। বরং বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাকে পাকিস্তান-রক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি পাকিস্তান রক্ষার জন্য ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে প্রাণপণে আলোচনা চালিয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগ-নেতৃবৃন্দ একরাতেই পালিয়ে ভারতে চলে গেছেন। জিয়াউর রহমানও যে এপ্রিল মাসে ভারতে গেছেন সেটি উহ্য রাখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডের কথা উল্লেখ না করে যেভাবে জিয়াউর রহমানকে জেড-ফোর্সের প্রধান হিসেবে দেখানো হয়েছে, তাতে শিশু-কিশোররা একেই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাবাহিনী হিসেবে ভাবতে শুরু করবে। সে লক্ষ্যেই কথাগুলো লেখা হয়েছে।

স্কুলপর্যায়ের শিশু-কিশোরদের কাছে জিয়াউর রহমানকে ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালের সাহসীই শুধু নয়, শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে যুদ্ধশেষে শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমানের একক নেতৃত্বে স্বাধীন করা

www.pathagar.com

দেশটিতে পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে সন্ত্রাস, দুর্নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন; অবশেষে একদলীয় বাকশাল গঠন করে মানুষের বাকস্বাধীনতা হরণ করেছেন, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। তেমনি একটি স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশে সামরিক বাহিনী (ভাগ্য ভালো এখনো বলা হয়নি দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীর) কিছু সৈন্যের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে (একজন 'স্বৈরশাসকের' হত্যাকাণ্ডকে নির্মম বলার প্রয়োজন পড়ে কি?) সপরিবারে নিহন হন। এই কথাগুলোও পাঠ্যপুস্তকে লিখেছেন সাংবাদিক কাজী সাহেব।

হ্যাঁ, আমাদের দেশে দায়িত্বজ্ঞানহীন কারো হাতে কলম থাকলে তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে যা-খুশি তা লিখতে পারেন, তার শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, কোনো দলিলপত্র ছাড়াই তিনি যা-খুশি তা লিখে দিতে পারেন। তিনি বই লিখতে পারেন, পাঠ্যপুস্তকও রচনা করতে পারেন। তবে কোনো ইতিহাসবেত্তা দলিলপত্র দিয়ে কোনো বই লিখলে তা শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ক্রয়-কমিটি কিনবে কিনা বলা যাবে না। এখন অবশ্য দলিলও কোনো দলিল নয়, দলিলও নাকি বানানো যায় যখন খুশি, যেমন খুশি তেমনিভাবে। এমনই অবস্থা দেশে তৈরি হয়েছে যে, জ্ঞানবিজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সততা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই, মূল্য নেই—বিশেষত যারা বিএনপি-জামাতের রাজনীতির ধারক-বাহক হয়েছেন। জাতীয় ইতিহাসের যেসব অর্জনে তাদের অশংগ্রহণ নেই, তার কোনো কানাকড়ি মূল্য জাতীয় জীবনে থাকতে পারে সেই—বোধ, বিশ্বাস যেন বাংলাদেশে থাকতে নেই এবং সেটি দখল করে নেওয়ার জন্য 'বুদ্ধিজীবী'-লেখক বানানোও যাচ্ছে এই দেশে। অর্থ ও ক্ষমতার বিনিময়ে কেউ কেউ তাতেই যুক্ত হচ্ছেন। এর ফলে দেশে এখন রাষ্ট্রক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা পেতে অনেকেই অতীত বিশ্বাস, আদর্শ ত্যাগ করে দলে দলে বিকৃত ইতিহাস লেখায় যোগ দিচ্ছেন। এর বিনিময়ে অর্থ, ক্ষমতা, দলীয় আশ্রয়প্রশ্রয় ও পরিচিতি নিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী লিখছেন যা-কিছু ওপর থেকে বলা হচ্ছে, যা লিখলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুশি হবেন, বাহ্বা দেবেন, একটি উচ্চপদে নিযুক্তি পাইয়ে দেবেন তেমন বইও। অথচ এদের অনেকেই ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কারো কারো তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও ছিল, কেউ কেউ দীর্ঘদিন 'বাম' রাজনৈতিক বিশ্বাসের দাবিদারও ছিলেন। অবশেষে তাদের অনেকেই কিছু পাওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস লিখেছেন, কারো কারো জীবন ও রাজনীতিকে মহিমান্বিত করার জন্য ফরমায়েশি বই লিখেছেন, সেগুলো সরকারি অর্থে কেনা হচ্ছে; কেউ কেউ বেতার-টিভি, বেসরকরি চ্যানেলগুলোতে অহরহ 'বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী' পরিচয়ে আলোচক হিসেবে আসন অলঙ্কৃত (কলঙ্ককৃতই করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে) করে থাকেন; বিশেষ দিবসগুলোতে পত্রপত্রিকায় জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেন,

www.pathagar.com

পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ এবং আওয়ামী লীগকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় করে নিবন্ধ লেখেন, আলোচনার মঞ্চেও সে-ধরনের আলোচক হন।

চারদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস গঠন-পাঠন, লেখালেখি, আলোচনার যে ছড়াছড়ি তাতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের একাধিক সম্ভাবনাময়, মেধাবী প্রজন্ম; যারা সত্য ও প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে সত্যসত্যই এতদূরে অবস্থান করেছে যে, এদের বিশ্বাসের জগতে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের প্রকৃত ইতিহাস, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের প্রকৃত ইতিহাসকে ফিরিয়ে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। আমি জানি না, ইতিহাসবিকৃতির ফলে সৃষ্ট বিকৃত মানসিকতার এই পরিণতি দেশের রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞানমনস্কতা ইত্যাদি অগ্রসর চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, বোধ ও চেতনা গড়ে তোলার ভবিষ্যৎটি কী হবে—তা অনুমান করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠছে। যেসব অন্ধবিশ্বাস, ভুল ধারণা, বিকৃত মানসিকতা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারণা ও রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে তা দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর মেধার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানো মোটের ওপর অসম্ভব। তাহলে কী হবে আগামীদিনের বাংলাদেশের অবস্থা ভাবতেই কষ্ট হয়; খুঁজে পাই না কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর।

এবার এমন হতাশার মাঝেও উচ্চারণ করতে চাই : ইতিহাস নিয়ে তামাশা করা যায় না; অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, বিকৃত মানসিকতা ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দিয়ে দেশে মেধাবী, সৎ, দেশপ্রেমিক মানুষ গড়ে তোলা যায় না। ইতিহাসে এর জন্য চরম শাস্তি অপেক্ষা করে থাকে। আমরা আশা করব ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি যথাযথ সম্মান, নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের রেখে যাওয়া অর্জনকে সম্বল করে বাংলাদেশকে তারা প্রকৃত ইতিহাসে, ইতিহাসের মূলধারায় ফিরিয়ে নেবে। তবেই বাংলাদেশ বিকৃত ইতিহাস ও মানসিকতা থেকে মুক্ত এর মূলধারার বাংলাদেশকে খুঁজে পাবে—যেখানে ১৯৭১ সালের শক্তি ও সাহস জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবে, পুঞ্জীভূত সমস্যার মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ জুগিয়ে যাবে।

১৮ ডিসেম্বর ২০০৫, ভোরের কাগজ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কতটা সক্ষম?

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে সমস্যার অন্ত নেই, অধিকন্তু নতুন নতুন সৃষ্ট সমস্যায় এটি প্রতিনিয়ত ভারাক্রান্ত হচ্ছে। ফলে জাতির মেধার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে, সৃষ্টিশীল মানুষ গড়ার প্রধান নির্ভরশীল উপায় হিসেবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন পুরোপুরি অযোগ্য ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। দেশের নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত মহল, শিক্ষা-সচেতন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে বসেছে। উচ্চবিত্তের মানুষজন তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, দরিদ্র এবং সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নান কারণে ছিটকে পড়ছে। অথচ দেশে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার নামে সকল স্তরেই নানাধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্বল্পবিত্তের পরিবারগুলো ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য অর্থকড়ি ব্যয় করছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই, পাঠ্য বইপুস্তকেও নেই। ফলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষায় মেধাবী, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র, সমাজ ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে উঠতে পারছে না। জাতির জন্য এরচাইতে বড় ক্ষতির আর কিছু থাকতে পারে না। অথচ শিক্ষার নামবহনকারী বিভিন্ন ধারার হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, হাজার হাজার কোটি টাকা শিক্ষাখাতে প্রতিবছর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু এর থেকে যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম, জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী মানবসম্পদ গড়ে-তোলার ক্ষেত্রে আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি, ব্যর্থ হচ্ছি। আসলে জাতিগঠনের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেও গড়ে-তোলার কোনো পরিকল্পনা শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরসমূহ, এনসিটিবি, শিক্ষাবোর্ড সহ সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে খুব-একটা আছে বলে মনে হয় না। একটি দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাগোষ্ঠী কোনো সুষ্ঠু শিক্ষানীতির আলোকে নয়, বরং অ্যাডহক ভিত্তিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিয়ে আসছে—সেভাবেই পরিচালিত করতে সব সরকারকেই উদ্বুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

১. শিক্ষানীতিহীন শিক্ষাব্যবস্থা

একথা এখন ভাবতেই অবাক হতে হয়, লজ্জাও পেতে হয় যে, স্বাধীনতার এত বছরেও বাংলাদেশ একটি শিক্ষানীতি এ-পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। অথচ প্রতিটি সরকার ক্ষমতায় এসেই একটি করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে থাকে; কমিটি একটি করে প্রতিবেদনও তৈরি করে সরকারের কাছে জমা দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকার সময়ক্ষেপণ করে জনগণকে শিক্ষা নিয়ে নানা কথা শোনায়; রাজনীতিবিদ, শিক্ষকসমাজ, ছাত্রসংগঠনগুলো ঐসব প্রতিবেদন নিয়ে কোনো চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির পক্ষে-বিপক্ষে দলীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে, অবশেষে সরকারের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। এভাবে দেশে এ-পর্যন্ত ৬টি শিক্ষানীতি বিষয়ক কমিশন গঠিত হয়েছিল, ৬টি প্রতিবেদনও তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিবেদনটি ছাড়া বাকি সবকটিই হিমাগারে চলে গিয়েছে। আওয়ামী লীগের আমলের প্রতিবেদনটিও কাটছাঁট করার পর যে রূপে তা গ্রহণ করা হয় তা জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এরপর সরকার-পরিবর্তনের পর সেই গৃহীত শিক্ষানীতিও পরিত্যাজ্য হয়।

আসলে একটি শিক্ষানীতির জন্য সরকারের মধ্যে ব্যাপক সদিচ্ছার যেমন প্রয়োজন থাকা দরকার, তেমনি এটির বাস্তবায়ন দেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনাও সরকারের থাকতে হয়। শিক্ষানীতি নিয়ে কোনো সরকার আমলাদের পরামর্শের বাইরে যায়নি, আমলাদের পরামর্শক্রমে শিক্ষানীতি প্রণয়নে সেই সদিচ্ছা এবং পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করতে পারেনি। বস্তুত এভাবেই আমাদের জাতীয় জীবন থেকে তিনটি দশক চলে গেছে। জাতি লাভ করতে পারেনি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে-তোলার শিক্ষানীতি। ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোনো জাতীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মৌল আদর্শকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারেনি; দেশের নতুন প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষালাভ থেকে এ-কারণেই বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য করণীয় সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে থাকে দুর্নীতি ও লুটপাটে নিয়োজিত আমলা ও রাজনীতিক গোষ্ঠী। দেশের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কী হবে, স্বাধীনতার ঘোষক কে হবেন, এ-বছরের বইতে স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ কত লিখতে হবে—ইত্যাদি সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশও আসে আমলাদের ভবন থেকে। শিক্ষকদের করণীয়, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা, চাকরির সুযোগসুবিধা দেওয়া না-দেওয়া সবই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান থেকে। এ সবই করা হচ্ছে কোনো শিক্ষানীতির আলোকে নয়, বরং আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি থেকে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ব্যাপক বৈষম্য, মানের সংকট,

www.pathagar.com

দুর্নীতি, পশ্চাৎপদ মানসিকতার প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। গোটা জাতি এভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানভিত্তিক প্রকৃত শিক্ষা লাভ থেকে।

২. স্তরভিত্তিক বৈষম্যমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে যতবেশি বিলম্ব ঘটেছে, ততবেশি স্বার্থবাদী মহল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে; শিক্ষানীতি সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে একটি মহল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। একটি শিক্ষানীতি কার্যকর না-হওয়ার ফলে দেশে শিক্ষার নামে ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় সস্তা আবেগ ছড়ানোকে কাজে লাগানো, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা, বিভিন্ন বিদেশী গোষ্ঠীর স্বার্থে নানাধরনের সম্পর্ক গড়ে-তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে কোনো কোনো মহল থেকে। এমন নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের চোখের সম্মুখেই যত্রতত্র গড়ে উঠেছে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে চরম নৈরাজ্য , মারাত্মক বৈষম্য, বিভ্রান্তিকর অবস্থা—যা দূর করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তরভিত্তিক এসব শিক্ষার ধারাসমূহ নিম্নরূপ :

ক. প্রাক-প্রাথমিক

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা এবং বাস্তবতা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে ছিল না। তবে বাড়িতে ও মক্তবে ধর্মশিক্ষার নামে আরবি বর্ণমালা পড়তে শেখা অনেকটা বাধ্যতামূলক ছিল, এখনো এর প্রচলন অব্যাহত আছে। তবে গত শতাব্দীর সত্তর এবং আশির দশক থেকে শহরাঞ্চলে শিশুশিক্ষার বইপুস্তক, নিয়মনীতি ও কোনোপ্রকার অনুমোদন ছাড়াই বেসরকারি উদ্যোগে কেজি স্কুল নামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে-ওঠা শুরু করেছে। সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের প্রকৃতির-গাছপালা, তরুলতা, পশুপাশি, ফলমূল, খেলাধুলা, রং-তুলি আর নাচগানের মধ্যদিয়ে শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো—এগুলোর প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবতা তৈরি হয়।

আমাদের দেশে একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমশ্রেণীর আগে শিশুশ্রেণী বলে একটি ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। সেখানে শিশুদের অক্ষরজ্ঞান তথা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো হত। কিন্তু কখন কীভাবে যে স্কুল থেকে তা উঠে গেল তা বোঝাই গেল না। এরি মধ্যে শহরাঞ্চলে ব্যক্তি-উদ্যোগে বিদেশী নানা বাহারি নামধাম ও বইপুস্তক এনে কেজি স্কুলের পসরা সাজানো হয়েছে: কিন্তু সরকারের মধ্যে দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন বা বিদ্যায়তন গড়ার নিয়মনীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোনো উদ্যোগ এ-পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ

www.pathagar.com

শিক্ষার সঙ্গে তেমন কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা নেই, এমন অসংখ্য ব্যক্তি বাসাবাড়িতে কেজি স্কুল খুলে বসে গেছেন। এটি কারো জন্য হয়েছে আত্মকর্মসংস্থানের উপায়, আবার কারো জন্য হয়ে পড়েছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্যোগ। এটি এখন শহর ছেড়ে গ্রামেও প্রসারিত হচ্ছে। অথচ এসব কেজি স্কুলের কোনো অভিন্ন শিক্ষাক্রম নেই, শিক্ষার মানের পরিবেশের বাধ্যবাধকতাও নেই, নেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা এবং বেতন-স্কেল নির্ধারণের নিয়মও।

কেজি স্কুলের লাগামহীন প্রসারের পরও দেশের মোট শিশুর ৮০ শতাংশেরও বেশি এই ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের দরিদ্র শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই ৬/৭ বছর বয়সে অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই বেশিরভাগ শিশু অক্ষরজ্ঞানহীন, কেজি স্কুলের ৩ বছরের নার্সারি, কেজি-১, কেজি-২ ক্লাসের প্রস্তুতি নিয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রথমশ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে। বৈষম্যের এমন মাত্রাহীন ব্যবধানকে ঘুচিয়ে বা কমিয়ে আনা অবহেলিত ৮০ শতাংশের বেশি শিশুদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে তেমন আর হয়ে উঠে না।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার নামে বিভিন্ন ধারা, উপধারার অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন : ১। মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষার নামে সরকারি ও বেসরকারি (রেজিস্টার্ড, নন-রেজিষ্টার্ড, কেজি স্কুলের অধীন) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; ২। ধর্মশিক্ষার অধীন এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা, কোরানে হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা স্কুল; ৩। ৩ বছর মেয়াদী বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুল; ৪। ইংরেজি মাধ্যম (দেশী-বিদেশী শিক্ষাক্রম) স্কুল ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এসব ধারা-উপধারায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভক্তির ফলে সকল শিশুই জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অভিন্ন শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে বড়ধরনের বৈষম্য এবং বিভাজনের শিকার হচ্ছে। মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি-বেসরকারি নানা উপাধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে ন্যূনতম সমতা বিধান করা হচ্ছে না। এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি (রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড) স্কুলের দক্ষতায় যেমন বড়ধরনের তারতম্য রয়েছে; আবার শহরের বেশিরভাগ বেসরকারি এবং মিশনারি স্কুল নিজস্ব উদ্যোগে ইংরেজির বাড়তি কোর্সসহ বিশেষ কার্যক্রম প্রতিযোগিতা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মাদ্রাসাশিক্ষার অধীন এবতেদায়ি, কাওমি, কোরানে হাফেজিয়া এবং এতিমখানা স্কুলের কোনোটির সঙ্গে

www.pathagar.com

কোনোটির শিক্ষাক্রমের সামঞ্জস্য নেই। হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের আরবিভাষাজ্ঞান না-শিখিয়ে কোরান শরিফ মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে, মাতৃভাষা বাংলাসহ প্রাথমিক শিক্ষার অন্যান্য শিক্ষাক্রমের বাধ্যবাধকতা তাদের নেই বললেই চলে। কওমি মাদ্রাসা মূলত কোরান ও হাদিসের সমন্বয়ে ইসলাম ধর্মশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং এতিমখানা স্কুলগুলোর শিক্ষাক্রম ধর্ম এবং মূলধারার শিক্ষার পাঁচমিশালি হওয়ায় ঐ বয়সের শিশুরা তা ধারণ করতে পারছে না। বিভিন্ন এনজিও সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলসমূহ শহর এবং গ্রামাঞ্চলের গরিব শিশুদের মধ্যে যে প্রাথমিক শিক্ষা দান করে থাকে তা দেশের সাক্ষরতার হার কিছুটা বৃদ্ধি করতে অবদান রাখলেও শিক্ষার্থীদের জীবনে ঐ সামান্য শিক্ষা খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারছে না।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য শিক্ষার মানের আয়োজনে নিজেরা এতটাই দরিদ্র ও সুযোগসুবিধাবিহীন যে, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী সেগুলো থেকে শিক্ষার কোনো দক্ষতা অর্জন না করেই পরবর্তী মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করে থাকে—যা পরবর্তী শিক্ষাক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। বস্তুত একধরনের শিক্ষাপ্রতিবন্ধী মানসিকতায় এরা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অপরদিকে দেশের সচ্ছল পরিবারের শিশুদের একটি অংশ দেশি-বিদেশি ইংরেজিমাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

দেশের এতসব নামধারণকারী ধারা-উপধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেহাল অবস্থার পাশাপাশি শিক্ষাক্রমে রয়েছে অপ্রয়োজনীয় বহুমুখিতার জটিলতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভিত তৈরি করার জন্য মাতৃভাষা, গল্প-কবিতা, বিদেশি ভাষা শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পরিবেশজ্ঞানসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষার দক্ষতার উন্মেষ ঘটানোর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পাঠদানের আয়োজন, দক্ষ শিক্ষকের সমাবেশ ঘটানো ইত্যাদি কোনোক্ষেত্রেই যথার্থ মান অনুসরণ করা যাচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যে দু-কোটির মতো শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারছে না; অন্তত ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে বিদায় নিচ্ছে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাও একই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত।

গ. মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থায় মূলধারার মাত্র ৩১৭টি সরকারি স্কুল,এমপিওভুক্ত ১৫ হাজারের বেশি বেসরকারি স্কুল, ইংরেজিমাধ্যম স্কুল, এমপিভুক্ত নয় এমন বেসরকারি স্কুল, ক্যাডেট কলেজ এই ধারার সঙ্গে যুক্ত আছে। এছাড়া মাদ্রাসার দাখিল, কারিগরি ধারাও মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে রয়েছে। লক্ষণীয়, মাধ্যমিক স্তরে

www.pathagar.com

সরকারি হাই স্কুল এবং ক্যাডেট কলেজ ছাড়া অন্যান্য ধারার সবকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। এই স্তরে শিক্ষার সিংহভাগ দায়িত্ব কাঁধে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি এমপিওভুক্ত, নন-এমপিওভুক্ত, বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা (দাখিল), কারিগরি মাধ্যমিক শিক্ষাকে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটাই অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বা মানসম্পন্ন পাঠদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো অবস্থানে নেই; এগুলোর মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্যে বড় ধরনের তারতম্য রয়েছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ওপর। মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যূনতম কোনো মান কোথাও রক্ষিত হচ্ছে না। এর কিছুটা নমুনা আমরা দেখতে পাই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে যেখানে স্কুল, মাদ্রাসা বা প্রতিষ্ঠানভেদে পাসের হারে তারতম্য ঘটে থাকে।

মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন ধারার শিক্ষাক্রম গতানুগতিক ও পশ্চাৎপদ চিন্তাধারায় আবৃত। আজকের বৈশ্বিক পরিবর্তনে অংশীদারী হওয়ার মতো শিক্ষার প্রস্তুতি বাংলাদেশের মাধ্যমিকসহ কোনো স্তরের শিক্ষাক্রমে নেই। সমাজ, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের অনুসন্ধানী মান তৈরিতে আমাদের শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের জীবনে তেমন প্রভাব ফেলার মতো নয়। ছাত্রছাত্রীদের মূলতই প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কিংবা ভালো ফলাফল করার জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। জ্ঞানের জগতে প্রবেশ ঘটানোর জন্য তাদের প্রস্তুত করার বিবেচনা শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তেমন একটা নেই। ফলে দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের তেমন কোনো প্রভাব শিক্ষার্থীদের জীবনবোধ ও আচরণে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনায় তেমন কোনো পরিচয় লাভ বা দক্ষতা অর্জন ছাড়াই মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন অতিক্রম করে থাকে—যা একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সবচাইতে বড় ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

ঘ. উচ্চ মাধ্যমিক

দেশের মূলধারার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ৪-ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত। শহর-উপশহরাঞ্চলে অনুমোদনহীনভাবে গড়ে-ওঠা 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ', বেসরকারি এমপিওভুক্ত, এমপিওভুক্ত নয় এবং সরকারি উচ্চমাধ্যমিক , ডিগ্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে। উচ্চমাধ্যমিকের নিজস্ব একক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমন বেশি নেই, যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে শহরাঞ্চলের বেসরকারি স্কুল, সিটি করপোরেশন স্কুলসহ দেশের বেসরকারি, সরকারি উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ এবং

www.pathagar.com

ক্যাডেট কলেজে ছাত্রছাত্রীরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এগুলোতে লেখাপড়ার মানের ভিন্নতা রয়েছে। আবার মাদ্রাসাতে আলিম কোর্স পরিচয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার আর-একটি ধারা প্রচলিত আছে। দেশের ডিগ্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের ওপর উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের চাপে কোনোটার প্রতিই যথাযথ যত্ন নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এসব কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্রমাবনতিশীল হচ্ছে।

তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক বিষয় ও বিভাগকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানার্জনের চাইতে পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রাপ্তি, সহজে পাস করার উপায়কে বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকে। এর ফলে একজন ছাত্র বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য শাখায় অপরিহার্য কিছু কিছু বিষয়কে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে শিক্ষাসনদ লাভ করে থাকে। উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতাকে বাদ দিয়ে পরীক্ষায় অধিক নম্বর প্রাপ্তির ছাত্রছাত্রীদের বিবেচনাকে অবারিত করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্য শাখায় মূল বিষয়সমূহকে ভেঙে বের করা একাধিক শাখা ও বিষয়ে বিভক্ত করা মোটেও ঠিক হয়নি। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐসব বিভাগের মৌলিক ধারণাই গড়ে ওঠেনি। এর প্রভাব পড়েছে তাদের উচ্চশিক্ষায়।

ঙ. উচ্চশিক্ষা

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার নামধারী প্রতিষ্ঠান ও স্তরের কোনো অন্ত নেই। এগুলোর কোনো-কোনোটির ব্যবহারিক উপযোগিতা আদৌ আছে কিনা সন্দেহ আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে পাস ও অনার্স, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স মিলিয়ে একটি চরম হযবরল অবস্থা উচ্চশিক্ষায় বিরাজ করছে। অধিকন্তু ৫৪টির অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাতারাতি যাকে-তাকে অনুমোদন দিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটিকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করে ফেলা হয়েছে। দেশের ২৮টির মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও বেশ শোচনীয়, মানের কোনো বালাই নেই। শিক্ষাক্রমে বিষয়ভিত্তিক আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলতে গেলে তেমন কিছু নেই, গবেষণার কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। সবকিছু মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা চলছে নামমাত্র, মানহীন; মেধা ও মনন চর্চা থেকে অনেকটাই দূরে। দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,তথ্য-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি হরেক রকমের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এখন চালু আছে। লেখাপড়ার মান, গবেষণার সুযোগসুবিধা, ফলাফলের কৃতিত্ব নিয়ে এগুলোতে কেউ এখনো পর্যন্ত কিছু উচ্চারণ করতে পারছে না। বস্তুত শিক্ষার সর্বত্র বাণিজ্য এবং সার্টিফিকেট বিতরণের বাইরে তেমন কোনো কৃতিত্বের দাবি করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

৩. শিক্ষক নিয়োগে মেধা নয়, দুর্নীতি এবং দলীয় বিবেচনাই প্রাধান্য

দেশবিভাগের পর শিক্ষাক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা একসময় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে পূরণ করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে শিক্ষকনিয়োগে মানসম্মত কোনো নীতিমালা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর ছিল না। শিক্ষকতা পেশাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন সর্বনিম্ন স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও মেধাবীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেই। প্রাক-প্রাথমিক ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তেমন কোনো বেতনকাঠামো নেই, বিষয়টি মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকনিয়োগে নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতনস্কেল তেমন সম্মানজনক নয়, এক্ষেত্রে শিক্ষকনিয়োগের নির্বাচনী পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং আয়োজন থাকলেও শেষপর্যন্ত শিক্ষকনিয়োগে ঘুস, দলীয় রাজনীতি এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়টি ঘুস, দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকনিয়োগে মেধা নয়, দলীয় ও আত্মীয়-পরিচয়ই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে গোটাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোথাও প্রকৃত মেধাবীদের স্থান তেমন নেই। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থায় পাঠদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনিতে ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরশীলতা

এটি ভাবতে খুবই কষ্ট হয়ে যে, দেশের কোনো স্তরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ পাঠদান করা হচ্ছে না। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষাস্তরে কোচিং ছাড়া, শিক্ষকের বাসায় ব্যাচে পড়া ছাড়া শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা, পরীক্ষায় পাস করা যেন কিছুতেই হচ্ছে না। কোচিং ও প্রাইভেট পড়ার বিষয়টি মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ঢিলেতালে চলছে। সেশনজট, নিয়মিত ক্লাসহীনতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণার কোনো নিয়মনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অধিকাংশেই টাকার বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্রেডিং সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

৫. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দলীয়করণ

দেশের কোনো-একটি মহল্লার ছোটখাটো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এখন আর দেশের রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। সরকার অনুমোদিত স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসায় সরকারদলীয় এমপি, মন্ত্রী, তাদের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, দলীয়

www.pathagar.com

ক্যাডারগণ এখন শিক্ষক নিয়োগ, পরিচালনা পরিষদ, লেখাপড়া, ছাত্রভর্তি, নির্মাণকাজসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকারি স্কুল-কলেজেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় বিভাজন, আনুগত্য, সুযোগসুবিধা নেওয়া, পাওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দলাদলিতে তারাও বিভক্ত। শিক্ষকদের ওপর দলীয় নেতাকর্মী, ছাত্রসংগঠনগুলো যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তাতে শিক্ষাদীক্ষা, ভর্তিপরীক্ষা, সাধারণ পরীক্ষা—কোনোটাই যথাযথভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা, সবকিছু ওলটপালট করে দেওয়া, মিছিল-মিটিং-এর ধরন-ধারণও বদলে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন ছাত্ররাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতির দখল, টেন্ডারবাজি, প্রতিপক্ষকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নের কর্মকাণ্ড অবাধে চলে। দেশের বেশিরভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখন আধুনিক ধ্যানধারণার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা থেকে দূরে সরে গেছে, এগুলোতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার প্রভাব বেড়ে গেছে। প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, জামাত-শিবিরের ধারক-বাহক ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্নে প্রথমশ্রেণী লাভ এবং শিক্ষকতার পদ অলংকৃত করছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের উচ্চশিক্ষা মানের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছে—এটি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষাপ্রশাসনে সীমাহীন দুর্নীতির কাছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা জিম্মি হয়ে আছে।

৬. একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা

ইতোমধ্যে আমরা একবিংশ শতাব্দীর পাঁচটি বছর অতিক্রম করতে চলেছি। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা নিয়ে কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন না, বরং তারা একমুখী ও বহুমুখী শিক্ষা এবং বই-পুস্তকে ইতিহাসবিকৃতি, ধর্মশিক্ষার নামে বাড়াবাড়ি ইত্যাদি নতুন নতুন ইস্যু তৈরি করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একবারে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। অথচ একবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি বছর জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি ও সাহিত্যচিন্তায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে এর সঙ্গে ঢেলে না-সাজানো হলে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার কোনো ধারণাকেই ধারণ করা নতুন প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, মানসম্মত শিক্ষাক্রম, বিষয়বস্তু, পঠনপাঠন, গবেষণাকর্ম প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য দেশ ও জাতির মেধাবীদের শিক্ষাকতার পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের হাতেই দেশের শিশু থেকে তরুণদের শিক্ষা ও গবেষণার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

www.pathagar.com

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনো সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবে নয় বরং মৌলিক জ্ঞানবিজ্ঞানের দর্শন, নতুন নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার স্রোতে প্রবাহিত করতে হবে। এছাড়া দুর্নীতির কারাল গ্রাস থেকে এটিকে মুক্ত রাখতে হবেই।

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি দশক, বছর, মাস ও দিনক্ষণ অভূতপূর্ব পরিবর্তনের কর্মযজ্ঞে চলছে। বাংলাদেশের শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণীদের মেধায় উন্মেষ ঘটাতে একটি একুশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষানীতিতে দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। তা করা গেলেই বাংলাদেশ তার নিজস্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তিসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। বিশ্বের দরবারে একটি মেধাবী, শিক্ষিত, কর্মদক্ষ জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে দাঁড়ানোর এটিই একমাত্র পথ। অন্যপথে চললে আমাদের জন্য হয়তো হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো ইন্‌কা এবং মায়া সভ্যতার মতো ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। তেমনটি যেন না ঘটে সে-সম্পর্কে আমাদের সকল মহলকে সচেতন থাকতে হবে।

www.pathagar.com

স্কুলপাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকার বিকৃত উপস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার অবদান এবং অবস্থান সুবিদিত। তাঁরা সকলেই তাঁদের দেশপ্রেম, মেধা, ত্যাগ স্বীকার এবং জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এক-একভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা ইতিহাসে আপন কর্মেই অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন। বাংলাদেশের জনগণ চিরকাল ঐসব নেতার অবদানের কথা জানতে চেষ্টা করবে, তাদের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যিনি রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রেরণাশক্তি দিয়ে সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজগঠনের কর্মযজ্ঞের প্রধান নেতা ও বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক সংগ্রাম, অদম্য সাহস, সময়োচিত কর্মসূচি এবং জাতীয়ভাবে অর্জনের অসাধারণেত্বর মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্ব অতিক্রম করতে পেরেছিল তাঁর পূর্বেকার এবং সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক অবস্থানকে; যে-কারণে ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়েছে হাজার বছরের অনন্য, অসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে। তাঁর এই আসন নির্মিত হয়েছে গোটা জাতির মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং শোষণমুক্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে। সুতরাং, বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এই ঐতিহাসিক পর্বের মহানায়কের সকল ঐতিহাসিক ভূমিকা ইতিহাস-নির্ধারিত এবং সকলপ্রকার হীন বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার মতো বিষয়। জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে গৌরবময় এই পর্বের অবস্থান এবং গুরুত্বই তাই আলাদা।

দেশের পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, রাজনীতি, নেতৃত্বসহ সকল প্রশ্নে একটি স্বচ্ছ ধারণা রাখবে; জাতীয় ইতিহাসের

www.pathagar.com

প্রতি এবং আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে; প্রেরণা লাভ করবে—এটিই প্রত্যাশিত। তাহলেই কেবল ইতিহাসের প্রেরণা, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সম্মুখে চলতে শিখবে, জাতীয় জীবনের সকল বাধা-বিপত্তি ও দুর্যোগ অতিক্রম করতে পারবে। সে-কারণেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমস্যা-সম্ভাবনার প্রকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দীর্ঘসময় ধরে সামরিক-আধাসামরিক শাসন এবং আওয়ামী লীগের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও বিদ্বেষী শক্তিসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ নিয়ে স্কুলপাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস-নির্মিত ও নির্ধারিত স্থান এবং ভূমিকাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত ও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাঁর যথাযথ আসন থেকে তাঁকে পাঠ্যপুস্তকে লেখা ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়নি, ছুড়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে রাষ্ট্রশক্তির এমন নগ্ন হস্তক্ষেপ ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মনগড়া, বানোয়াট, মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাসের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকাকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে; শিশু-কিশোর ও তরুণদের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর একটি বিকৃত ভাবমূর্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিদ্বেষভাবাপন্ন, ইতিহাসশিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধহীন সরকারি মহল প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে মনগড়া কথা লিখে জাতীয় ইতিহাসকেই শুধু নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই শিক্ষার আদর্শের দিক থেকে কলঙ্কিত করে চলছে। দেশের মেধাবী, দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্র, নারীসমাজসহ সকল দায়িত্বশীল মহলকে এমন বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, করণীয় নির্ধারণ করা, জনগণকে সচেতন করাসহ ব্যাপক প্রস্তুতি ও কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। তবে গতানুগতিক বক্তৃতা নয়, বরং পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত উপস্থাপনাকে হাতে নিয়ে তলিয়ে দেখা এবং ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে ভয়াবহ এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিতে হবে।

বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ে জাতীয় ইতিহাসের পঠনপাঠন কোনোকালেই মানসম্মত ছিল না। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় তেমন স্বচ্ছভাবে ঘটছে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিষয়বস্তু তেমন শিক্ষণীয় বা আকর্ষণীয় ছিল বলা যাবে না। সেই পর্বের বিষয়বস্তুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

www.pathagar.com

রহমানের নাম প্রসঙ্গক্রমে লেখা থাকলেও বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিয়ে তাঁর জীবন ও রাজনীতি উপস্থাপিত হয়নি। স্কুলপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা'র ১৯৯৬-৯৭ সালের সংস্করণে। অথচ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি এবং জাতির জনক হিসেবে তাঁর জীবনী পাঠ্যপুস্তকের অনেক আগেই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। পৃথিবীর সব দেশে জাতির জনকদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে বিশেষভাবে পঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু তেমনটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় বঙ্গবন্ধু নিজে থাকাকালেও হয়নি। এরপর ১৯৭৫ সালের পর থেকে পাঠ্যপুস্তকে তাঁর ঐতিহাসিক অবস্থান এবং ভূমিকাকে ক্রমেই সংকুচিত করা হয়েছে। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচন, ৭মার্চ-এর রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসভার ভাষণ এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের পূর্বে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তাঁকে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মোটেও উপস্থাপন করা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা কে, কেন তিনি প্রধান—এর কোনো ধারণা পাঠ্যপুস্তকে রচিত বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ইতিহাস-অধ্যায়ে এতদিন সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'সাহিত্য কণিকা'য় বঙ্গবন্ধুর জীবনীমূলক রচনাটিতে তাঁর জীবন ও রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পরিচয় ঘটানো হয়েছিল মাত্র। বস্তুত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির তিন পর্ব, যথা—পাকিস্তানকালে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রব্যবস্থায় শোষণমুক্তির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে নেওয়া উদ্যোগ সম্পর্কে স্কুলপাঠ্যপুস্তকের কোর্স কারিকুলামে কোনো বিশেষ ধারণা দেওয়া হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা প্রসঙ্গে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকে যেসব অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা তা আংশিকভাবে সংশোধন করলেও সামগ্রিক কারিকুলামে তেমন কোনো বড়ধরনের পরিবর্তন নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

তবে ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর জোটসরকার শপথ গ্রহণের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেসব কাজে হাত দিয়েছিল তার মধ্যে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা অন্যতম ছিল। জোটসরকার বেশ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য। ফলে ২০০২ শিক্ষাবছরের সকল পাঠ্যপুস্তকে জোট সরকার যেসব পরিবর্তন নিয়ে আসে তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবস্থান ও ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো, তদস্থলে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতা, বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উপস্থাপন করার উদ্‌যোগ

www.pathagar.com

নেওয়া হয়; পরিবর্তন করা হয় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু, বাদ দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তথ্যনির্ভর জীবনী; অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্য নিয়ে লেখানো হয় নতুন করে তাঁর আর-একটি জীবনীমূলক রচনা; পক্ষান্তরে মুক্তিযুদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে জিয়াউর রহমানের জীবনের ওপর ভিত্তি করে মনগড়া জীবনী চতুর্থ ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর পাশে সমান্তরালভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে একদিকে বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত বিতর্কিতভাবে, অপরদিকে জিয়াউর রহমানকে 'জাতির ত্রাতা' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি, সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও অন্যান্য স্কুল পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনাপর্বে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে কখনো মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, কখনো শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, কখনোবা সোহরাওয়ার্দীকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক গুরু, প্রবীণ তথা মূলনেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; তবে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতা হিসেবে জিয়াউর রহমানকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, বলা হয়েছে : "শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের অবর্তমানে দিশেহারা ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে বাংলার মানুষরা। সেই প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে অবস্থিত কালুরঘাট অস্থায়ী বেতারকেন্দ্রে হাজির হয়ে ২৬ মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।" (১০, পৃষ্ঠা ১৫৫)।

স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ৪-দলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' তৃতীয় খণ্ডে পরিবর্তন আনা হয়েছে, মেজর জিয়াউর রহমানের নামে একটি ঘোষণাপত্রের দলিল লেখানো হয়েছে এবং সেটি পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজপাঠ্যবইতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০০৬ সালের সংস্করণে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জোটসরকার কোনো-কোনো পাঠ্যবইতে জিয়াউর রহমানের ঘোষণার তারিখ ২৬ মার্চ, কোনো-কোনো পাঠ্যপুস্তকে ২৭ মার্চ উল্লেখ করেছে—যার ফলে স্কুল-ছাত্রছাত্রীরা নতুন করে বিভ্রান্তিতে পড়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমান জোটসরকার এর কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো দলিল জাল করছে, কখনো তারিখ পরিবর্তন করছে, কখনো ঘোষণার স্থান ও পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তন করে চলছে। তবে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জোটসরকার চরম অস্বস্তি এবং স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে আছে, সেটিই বোঝা যাচ্ছে। জোটসরকার নিজেই এ-ব্যাপারে কোনো স্থিরসিদ্ধান্ত নিতে পারছে না—যেন বিষয়টি তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে! জোট সরকারের হাতে পড়ে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাসই শুধু পদদলিত এবং কলঙ্কিত হচ্ছে না, পাঠ্যপুস্তকে এ নিয়ে বিরাজ করছে চরম

www.pathagar.com

বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিও। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে শুধু বিভ্রান্তিতেই পড়েনি, এর প্রতি আকর্ষণও সর্বতোভাবে হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

২০০১ সালের পর ৪র্থ শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি' এবং অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা'য় বঙ্গবন্ধুর যে দুটি জীবনীমূলক রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোতে বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মকাণ্ডকেই সাদামাটাভাবে, অথবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত 'শেখ মুজিবুর রহমান'-এর জীবনীতে যা লেখা হয়েছে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। প্রশাসক হিসেবে তিনি সার্থকতা দেখাতে পারেননি। ১৯৭৪-৭৫ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। গুপ্তহত্যা চলে, স্বাধীন মতামত প্রচারে বাধা আসে, রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নেমে আসে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে পরিস্থিতি হয় শ্বাসরুদ্ধকর। সে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক অভ্যুত্থানে তিনি তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত সপরিবারে নিহত হন।" (৭, পৃষ্ঠা ৭৬)

তবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে আরো বেশি খাটোভাবে, বিকৃত তথ্য ও ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা'য়। লেখক কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর জীবনীটিকে যেভাবে লিখেছেন তা পড়ে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে শেখ মুজিব কোনো সম্ভ্রান্ত বংশে নয়, বরং 'গোপালগঞ্জ মহকুমা আদালতের কর্মচারীর' ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, এছাড়া তিনি 'গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ২২ বছর বয়সে মেট্রিক পাস করেন', এরপর 'কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন'। এর পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রেই শেখ মুজিবের উপস্থিতি এবং ভূমিকাকে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে চাতুর্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত তার এ লেখা পড়ে কোনো শিক্ষার্থীই শেখ মুজিব যে একজন বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বড়ধরনের ভূমিকা রেখেছিলেন—তেমনটি মনে করবে না। লেখক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ডাক সম্বলিত অংশের একটি কথাও উল্লেখ করেননি। তিনি বরং (জোট সরকার পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখ মুজিবের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধু উপাধিটি সর্বত্র কেটে দিয়েছে) গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে "সংসদ অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে ৪ শর্তারোপকে" গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন যে, শেখ মুজিব স্বাধীনতা নয়, বরং পাকিস্তান রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। এরপর ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টি

www.pathagar.com

প্রাধান্য পায় : "২৫ মার্চের রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে।" এরপর ১৯৭২ সালে ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিব দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। দেশশাসনে তিনি ব্যর্থ হলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ,গুপ্তহত্যা, একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা ইত্যাদি ঘটনা দ্বারা কাজী সিরাজ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানকে যুক্তিযুক্ত করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সংবিধান প্রণয়ন, ২ কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নতুন শিক্ষানীতিসহ জাতীয় জীবনে নতুন চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কোনোটিই কাজী সিরাজের দৃষ্টিতে পড়েনি। সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধুর শাসন-আমলকে রচনাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সময়ের বাস্তব সমস্যাকে মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতা, চেষ্টা, যুদ্ধবিধ্বস্ত সমস্যাসংকুল দেশে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার ফিরে আসা, দেশের হাল ধরা, একটি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে রাষ্ট্র-প্রশাসনসহ সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের চিন্তা থেকে বাকশাল পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টিকে না-দেখে যেভাবে বইতে উপস্থাপনা করা হয়েছে তাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে শেখ মুজিবকে একজন একনায়ক, স্বৈরশাসক এবং ব্যর্থ প্রশাসক বলেই মনে হবে। রচনার প্রতিটি লাইনেই লেখকের নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বেশকিছু ভুল তথ্য এই রচনাটিতে লেখক উপস্থাপন করেছেন। বস্তুত চতুর্থ ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী দুটি একই লেখকের হাতে লেখা, তাতে জোটসরকারের আস্থাভাজন লেখক কাজী সিরাজ যে-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করেছেন তাকে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বলা হলেও উপস্থাপিত জীবনী পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধারণাই লাভ করছে এবং কাজী সিরাজেরই লেখা পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান' শীর্ষক জীবনীদুটোতে তারা দেখতে পাচ্ছে বাংলাদেশের 'প্রকৃত' স্থপতি, রূপকার, স্বাধীনতার ঘোষক, সর্ববিষয়ে সফল রাষ্ট্রনায়ক ও শাসকসহ সবগুণের অধিকারী জাতির কাণ্ডারী জিয়াউর রহমানকে—যাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা, বাংলাদেশ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের কথা আগামী দিনের তরুণরা হয়তো কল্পনাই করতে পারবে না!

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস নির্মাণে যে মহানায়ক তিলে তিলে গড়ে উঠেছিলেন, আন্দোলন সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সজ্জিত করে যুদ্ধের মাঠে প্রেরণ করেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যিনি আন্তর্জাতিক সকল প্রতিবন্ধকতা ও ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষণহীন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে একটি নিজস্ব পথ রচনা করতে চেয়েছিলেন—তাকে ৪ দলীয় জোট সরকার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে সম্পূর্ণরূপে ভুল ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তাঁর সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের মনে একধরনের অশ্রদ্ধা, ঘৃণাবোধ ও ভুল ধারণা তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। স্কুলপর্যায়ে অন্তত ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের খণ্ড খণ্ড বিকৃত ইতিহাস রচনার মাধ্যমে বর্তমান জোটসরকার তাদের পরিকল্পনা এভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিএনপি এবং জোটসরকার বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদানকে শুধু খাটো করেই দেখাতে চায় না, বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে উচ্ছেদ করে সেই স্থানে তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে বসাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এটি সম্ভবত তারা তাদের দলীয় রাজনীতির অস্তিত্বের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে বা বিবেচনা করছে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণভাবে তাদের একটি ভুল বিশ্বাস—যা ইতিহাসে কখনো ঘটানো যায় না।

মনে হচ্ছে বিএনপি বা জোটসরকারের রাজনীতির জন্য জাতীয় ইতিহাসের স্বাধীনতা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান বেশ অস্বস্তি এবং ঈর্ষার বিষয়। নতুবা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দখল করার জন্য বিএনপিকে এতখানি নির্লজ্জ হতে হবে কেন? তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে যেটুকু অবদান রেখেছিলেন তা তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক সরকারের প্রতি আস্থা এবং আনুগত্য প্রকাশ করেই করেছিলেন। অথচ বিএনপি এখন জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের বিকল্প বা প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করছে। রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে ২০০১ সাল থেকে সমস্ত শক্তি নিয়ে জোট সরকার জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কালিমালিপ্ত করা, বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করা, সেই স্থানে 'ত্রাতা' হিসেবে জিয়াউর রহমানকে এককভাবে আসীন করার আয়োজন বাস্তবায়ন করছে। এটিকে ইতিহাসে বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ইতিহাসে বলপ্রয়োগ করে কাউকে উচ্ছেদ করা এবং কাউকে বিশেষ স্থানে আসীন করার পরিণতি কারো জন্যই সুখকর হওয়ার নয়। ইতিহাসের মহানায়ক তাঁর আসনে অমর থাকবেন; পাঠ্যপুস্তকে বিকৃতভাবে তাঁর ভূমিকাকে উপস্থাপন করা, তাকে হেয় করার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার কোনো সম্পর্কে কোনোকালেই হওয়ার নয়।

তবে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর বিশাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে সাময়িকভাবে হলেও বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে—এটিই জোটসরকারের সাফল্য। পাঠ্যপুস্তকে এ-ধরনের বিকৃত ইতিহাস রচনার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের কারোরই আধুনিক ইতিহাস

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় নেই; বরং যারা মনগড়া তথ্যকে ইতিহাস মনে করেন, তেমন তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক জোট সরকারের বুদ্ধিপরামর্শে আওয়ামী-বিদ্বেষী অবস্থান থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুকে হেয়ভাবে উপস্থাপন করার কাজে যুক্ত আছে বলে দেখা যাচ্ছে। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এ বছর (২০০৬) পঞ্চম শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি : সমাজ' বইয়ের ভূমিকায় এনসিটিবির চেয়্যারম্যানের লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এ-ধরনের ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অংশ 'পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা' করে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দিয়ে থাকেন (দ্রষ্টব্য—ভূমিকা)। উক্ত দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধুর নাম যাবে কি যাবে না, জিয়াউর রহমানের কথা কতটুকু অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি ঐ দপ্তর থেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে তার কিছু নমুনা এই লেখকের হাতে রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে এসব ঘটনা পর্যালোচনা ও প্রত্যক্ষ করে একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, যারাই এ-কাজগুলো করছেন, কাজের ছাপ পাঠ্যপুস্তকে রাখছেন, তাতে শেষপর্যন্ত তাদের জ্ঞানের দৈন্যদশা ও মূর্খতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, আরো পাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের ঈর্ষাপরায়ণ মানসিকতাও। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পর্বতসম বিশালতার কাছে তাদের অবস্থান কোথাও চোখে পড়া বা গণনা করার মতো নয়। বাংলাদেশে ঐসব লেখক-আমলা-সাংবাদিকের অবস্থান হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে, আর জাতীয় ইতিহাসের মহানায়ক তাঁর ইতিহাস-নির্ধারিত স্থানেই যে আছেন তা সকল দৃষ্টিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ইতিহাসের এটিই হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় শিক্ষা। সেই শিক্ষার ওপর যেমনি আমাদের অসীম আস্থা রয়েছে, তেমনি সেই শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে ইতিহাসের পাঠটি যথাযথভাবে নিতেও আমাদের যেন আর ভুল না হয় সেই আহ্বানই দেশপ্রেমিক, বিবেক ও বোধসম্পন্ন সকল মানুষকে জানাচ্ছি।

[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন পালন উপলক্ষে ১৮ মার্চ ২০০৬, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাউবি আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ]

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার অবস্থান

এক

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার অবস্থান ও প্রভাব বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যা। শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক বিশ্বাস ও আচরণের অবস্থিতির সমস্যাটি খুবই স্পর্শকাতর এবং সে-কারণেই বেশ জটিলও। অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশও তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এই সমস্যাটি থেকে এখনো মুক্ত করে আনতে পারেনি। অথচ, গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে ধর্ম, বর্ণ ও জাগতিক পরিচয়ের চেয়ে নাগরিক পরিচয়েই মানুষ গৃহীত হবে। কেবল তা করা হলেই রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িক অবস্থান তথা গণতান্ত্রিক চরিত্র সংহত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং অসাম্প্রদায়িকতাই হচ্ছে আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মর্মকথা। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের জন্য যে-জনশক্তি তৈরি করছে তাদের হতে হবে আধুনিক এবং অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত। অথচ দুনিয়ার অনেক উন্নত দেশের পক্ষে এখনো এক্ষেত্রে যথাযথ মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে-তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য করে তোলার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা কতখানি জরুরি ও প্রয়োজনীয়, তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানারকম অভিযোগ ও সমালোচনা থাকলেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কতখানি তা নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণা তেমন কিছু একটা হচ্ছে না। বিষয়টিকে আমাদের দেশে কিছু কারণে স্পর্শকাতর ভাবা হচ্ছে। অথচ কেন এটি স্পর্শকাতর ও জটিল তা নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি হলে অনেকেরই ধারণাগত অস্পষ্টতা দূর হতে পারত। গবেষণা ও লেখালেখি হচ্ছে না বলেই এক্ষেত্রে বিরাজ করছে দারুণ অস্পষ্টতা ও স্পর্শকারতা। জ্ঞানের জগতে স্পর্শকাতরতার স্থান নেই, থাকার কথাও নয়। গবেষণা ও লেখালেখিই মানুষের চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারে। ফলে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে মুক্তচিন্তা ও মুক্ত আলোচনার পরিবেশ এবং সুযোগ প্রত্যাশিত মানে সৃষ্টি হচ্ছে না। এ কারণে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসমাজ—সামগ্রিকভাবে দেশের নাগরিক সমাজ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে,

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে-তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জটিল সমস্যার আবর্তে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।

অ্যাকাডেমিক বিতর্ক, লেখালেখি ও গবেষণার অভাবের কারণে আমাদের দেশে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জড়তা, অস্পষ্টতা, গুলিয়ে ফেলার প্রবণতাসহ নানা সমস্যায় এমনকি আমাদের উচ্চতর শিক্ষিতসমাজও আটকে আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের বিষয়াদি কীভাবে পঠিত বা উপস্থাপিত হবে তা নিয়ে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞমহলেরও নানা সংশয়, অবিশেষজ্ঞতা এবং অস্পষ্টতা তো আছেই। এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে দেশের স্কুলপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকেই। মনে রাখতে হবে, ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করাটা অতীব জরুরি। কেননা, স্কুল-পূর্ব বয়সে শিশুকালে তারা ধর্ম-সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাসকে শুধু গ্রহণ ও বহন করে নিয়ে আসে। ধর্ম তখন তাদের কাছে পিতা-মাতা, দাদা-দাদির মাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—তাতে মামুলি কিছু বিশ্বাস, নরকের কষ্ট-আতঙ্ক, স্বর্গের সুখপ্রাপ্তি, ইত্যাদিতে পরিচালিত করার একধরনের অনুশাসন ছাড়া আর কিছু নয়।

শিশুদের মনে ধর্মের প্রভাবটি যুগযুগ ধরে ওইভাবে ফেলা হয়েছে। আগে ধর্ম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন ছিল না, বই-পুস্তকের সঙ্গে অনেকেরই কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠত না। তাই অনুশাসনের বিষয় হিসেবে ধর্মের কতিপয় বিষয়কে শিশুদের মনে উপস্থাপনের মাধ্যমে খারাপ-ভালোর সঙ্গে নরক ও স্বর্গের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তার অখুশি-খুশি হওয়ার বিশ্বাস ও ভীতিকে তুলে ধরার বিষয়াদি আমাদের পূর্বপুরুষগণ দায়িত্ব পালনের তাগিদ হিসেবে অনুভব করতেন এবং তা পালনও করতেন। সেভাবেই তারা শিশুমনকে ধর্মীয়ভাবে প্রভাবিত করতেন। দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষা খুব একটা পাওয়া যেত না। গেল এক-দেড়শত বছরে ব্রিটিশ শিক্ষার প্রভাবে দেশে গড়ে-ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগটি একটি রূপ লাভ করেছে মাত্র। যদিও মধ্যযুগ থেকেই এখানে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, কিন্তু শিক্ষার দ্বার অত্যন্ত ধীরগতিতে উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে মাত্র গত শতাব্দী থেকে। তাতে ধর্মশিক্ষাও অনুষঙ্গ হিসেবে বর্তমান থেকেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ও উত্থান-পতন ঘটেছে। ধর্মশিক্ষাও এর সঙ্গে সঙ্গে গতি-প্রকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং, আমাদের দেশে ধর্মবিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। কথা হচ্ছে ধর্ম তারা কীভাবে শিখবে, চর্চা করবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মের উৎপত্তি, এর ইতিহাস, মর্মবাণী, প্রয়োগ-প্রসার, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান লাভ করলে এটিই শিক্ষা বিজ্ঞানের আদর্শিক দিক হতে পারে। এটি ঘটলে শিক্ষার্থীগণ বিশ্বজনীন ব্যবস্থায় নিজের ধর্মীয় অবস্থান, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরতে পারবে।

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার এ-ধরনের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তককে সাম্প্রদায়িক ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার তেমন পাঠ্যক্রমই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে। কিন্তু যখন গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনায় রাখা হয় না, তখন বিষয়টি আর সর্বজনীন থাকে না, হয়ে যায় বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের এককত্বকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রদর্শিত করা। এ-ধরনের মানসিকতা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পঠনপাঠনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একদেশদর্শী ও বিশেষ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে তুলতেই ভূমিকা রাখতে পারে বা রেখে থাকে। আমরা নিচের আলোচনায় তথ্যপ্রমাণসহ জটিল ও স্পর্শকাতর, তবে আধুনিক বিশ্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সমস্যাটি বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের পাঠ-উপকরণাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

দুই

বাংলাদেশের স্কুল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনার সূচনাতেই আর-একটি বিষয় সংশ্লিষ্টদের জানা দরকার আছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য ধর্মশিক্ষার আলাদা করে একটি পাঠ্যবিষয় রয়েছে। তবে বেসরকারি কেজি স্কুলগুলোর মধ্যে প্রথম শ্রেণী থেকে ধর্ম বিষয় অন্তর্ভুক্ত করারও প্রবণতা রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্মশিক্ষা পঠনপাঠনে অন্তর্ভুক্ত করাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমর্থন করা যায়। তবে এর বিষয়বস্তু (content) এতটাই গতানুগতিক, পুনরাবৃত্তিতে ভরপুর যে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মশিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে তেমন আকর্ষণ বোধ করে বলে মনে হয় না। অধিকন্তু একই স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের উৎপত্তি, মূলবাণী, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের ধর্মের মৌলিক মিল অমিল-কোথায়, কেন—এর কিছুই জানতে পারে না। বরং অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার ও শেখার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংস্কার ও বাধানিষেধও নানাভাবে কাজ করছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ধর্মকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পছন্দের ধর্ম বলে ভাবতে শুরু করে; নিজের ধর্মবিশ্বাসের বাইরের ধর্মকে গুরুত্বহীন, অবহেলার বা ভিন্নচোখে দেখার মানসিকতায় বেড়ে ওঠে। অন্য ধর্ম সম্পর্কে বই পড়ে জানার গুরুত্ব সমাদৃত নয়, বরং এতে পুণ্যের চেয়ে পাপের ভীতি রয়েছে। এই প্রবণতাটি আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেষ বিবেচনায় সাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্ম দিতে সাহায্য করে থাকে।

স্কুলশিক্ষাক্রমে আলাদা বিষয় হিসেবে ধর্মশিক্ষা থাকার পর সাধারণত বাংলাভাষা ও সাহিত্য, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাসসহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকেও বিশেষ কোনো ধর্মের উপস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে সকল জাতি-ধর্মের ছাত্রছাত্রীর জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রী অসহায়ত্ববোধ করে থাকে; তাদের ধর্মবিশ্বাস অন্য ধর্মীয়

www.pathagar.com

বক্তব্যে ঢাকা পড়ার পরিস্থিতিতে পড়ে। এ-ধরনের বাস্তবতা ও পরিস্থিতিই ইসলামধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবলভাবে নিজেদের ধর্মকে অন্য সবকটি ধর্ম থেকে আলাদা ও কর্তৃত্বপরায়ণ ভাবতে এবং বাকি শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি করতে সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা শিক্ষাব্যবস্থায় এভাবেই জন্ম ও বিস্তার লাভ করতে পারে।

তিন

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের পঠনপাঠনের সামগ্রিক পর্যালোচনায় এখন আমরা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কতখানি তা লক্ষ্য করার চেষ্টা করব। প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রণীত 'আমার বাংলা বই'-এর সূচিপত্র মূলত বাংলা বর্ণমালা, ছড়া, ছবিতে গল্প, রেখা অঙ্কন, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকেই আকস্মিকভাবে 'মহানবীর ভালোবাসা' নামক এক-পৃষ্ঠার একটি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। রচনাটি পড়ুন;

> মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তিনি সব মানুষকে ভালবাসতেন। পশু পাখি, জীবজন্তু এমনকি গাছপালাকেও তিনি ভালবাসতেন। একদিন হযরত মুহম্মদ (স.) একটি গাছের তলায় বসে কথা বলছিলেন, তিনি সাহাবীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। মহানবীর উপদেশ মেনে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরাই তাঁর সাহাবী বলে পরিচিত। হযরত মুহাম্মদ (স.) দেখলেন, কিছুদূরে একজন লোক গাছতলায় বসে গাছের পাতা ছিঁড়ছে। গাছের পাতা ছিঁড়ে ফেলা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি লোকটিকে ডাকলেন। বললেন, 'তুমি কি করছ?' লোকটি বলল, 'আমি গাছের পাতা ছিঁড়ছি।' হযরত মুহম্মদ (স.) বললেন, 'তোমার মাথার চুল ছিঁড়লে তোমার কেমন লাগবে?'
>
> লোকটি বলল, 'আমার কষ্ট হবে'।
>
> হযরত মুহম্মদ (স.) বললেন, 'গাছের পাতা ছিঁড়লে গাছও কষ্ট পায়।' লোকটি বলল, 'আমি আর কখনো গাছের পাতা ছিঁড়ব না, গাছকে কষ্ট দেব না।' মহানবী খুব খুশি হলেন।

জেনে নিই

(স.) = সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম; বাংলায় তার মানে, তার ওপর আল্লাহর আশিস ও শান্তি বর্ষিত হোক (১. পৃ. ৩৩) লেখা হয়েছে।

গল্পটি শিশুদেরকে গাছের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর শিক্ষার দিক থেকে অবশ্যই ভালো, সমর্থনযোগ্যও। কিন্তু, মনে রাখতে হবে এই বইটি দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ,

www.pathagar.com

খ্রিস্টান, পাহাড়ি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের জন্যও আবশ্যকীয় পাঠ। গল্পে হযরত মুহাম্মদ (স.) নামের সঙ্গে (স.) রয়েছে। গল্পশেষে 'জেনে নিই' উল্লেখ করে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' কথাটি বাংলায় অর্থসহ লেখা হয়েছে। অন্যধর্মাবলম্বী ও জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের কাছে এই গল্পের শিক্ষাটি হয়তো আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু গল্পের উপস্থাপনা এবং (স.)-এর ব্যবহার তাদেরকে বিব্রত করলেও সংখ্যালঘু ধারণার কারণে তা চেপে যাওয়া ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকে না। বিশেষত 'মহানবী' কথাটি বাংলাদেশের অন্যধর্মাবলম্বী এবং পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের কাছে প্রথমেই অস্পষ্ট মনে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শিক্ষক অথবা অগ্রজ কেউ মহানবী বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে তা বলে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে এ শব্দটির সার্বিক অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। গল্পের শেষে (স.)-এর আরবি উচ্চারণ বাংলায় লেখার ফলে যে উচ্চারণ শোনা যাবে তা তাদের পক্ষে পড়া বা বোঝা খুবই দুরূহ ব্যাপার হবে। বস্তুত অন্যধর্মাবলম্বীদের বিব্রত করা বা পড়তে বাধ্য করার কোনো Text(পাঠ্য)-এ যাওয়াকে শিক্ষা বিজ্ঞানের দিক থেকে এ পর্যায়ে মোটেও সমর্থন করা যায় না। অথচ, বইটির মুখবন্ধে বোর্ডের চেয়ারম্যান লিখেছেন "শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন ভাষা শেখার এ চারটি দক্ষতা যেন শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে 'আমার বাংলা বই'-এর পাঠ-উপকরণ নির্মাণ করা হয়েছে।" (২ পৃ. প্রসঙ্গকথা)। এনসিটিবির চেয়ারম্যানের দাবি আলোচ্য রচনাটিতে মানা হয়নি; বিশেষত অনান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পাঠ-উপকরণ নির্বাচন করা হয়নি—এটি স্বীকার করতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

প্রথম শ্রেণীর এ-বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় ছবি দেখে 'বাক্য পড়ি' শিরোনামে কিছু ছবি ও বাক্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ছবিতে মুসলমানদের ঈদের চাঁদ, কোলাকুলির কয়েকটি দৃশ্য আছে। এর নিচে লেখা হয়েছে, "আজ ঈদ। আজ উৎসব। চল ঈদগাহে যাই। নামাজ পড়ি। সবাই কোলাকুলি করি। ভেদাভেদ ভুলে যাই।" (৩. পৃ. ৩৭)।

এই পাঠ-উপকরণের বিষয়বস্তু একজন মুসলমান শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষণীয় হবে, কিন্তু ভিন্নধর্মাবলম্বী ও জাতিগোষ্ঠীর শিশুকে নামাজ পড়তে আহ্বান করার বিষয়টি মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ, এমনই পাঠ-উপকরণ তাদের পড়তে হচ্ছে। এতে শিশুদের কচিমনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাধীন সত্তায় বাধা আরোপিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের স্কুলের প্রথমশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে যদি 'চল পূজামণ্ডপে যাই, পূজা করি'-কথাটি লেখা হয়, তবে তা একজন মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ঘরের শিক্ষার্থীর পড়তে যেমন মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, অথবা তাদের অভিভাবকদের শুনতে যেমন কষ্টের কারণ হতে পারে, ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের ওপর ও পরোক্ষভাবে আঘাত বা বাধ্যবাধকতা হিসেবে মনে হতে পারে।

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকের এই অংশ পড়ার সময় আমাদের প্রথম শ্রেণীর ৬/৭ বছরের অন্যধর্মাবলম্বী বা জাতিগোষ্ঠীর শিশু এবং তাদের অভিভাবকরাও অনুরূপ মানসিক আঘাত অনুভব করতে পারেন। শিক্ষা তো কোনো শিশুকে মানসিকভাবে আঘাত দেওয়ার জন্যে হতে পারে না!

পাঠ-উপকরণটি কাল্পনিকভাবে স্থাপন করে চিন্তা করা হয়েছে। উপরে কাল্পনিক পাঠ-উপকরণটি যদি সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে ওইভাবে লেখা হত তাহলে নিশ্চয়ই মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান যে-কারণে text টি প্রত্যাখ্যান করত, একই কারণে সংখ্যালঘু ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষও মনে-মনে তা প্রত্যাখ্যান করবে এটি বুঝতে হবে। কিন্তু তারা হয়তো এ-সম্পর্কে তাদের মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারছে না। এর ফলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সম্পর্কে যে-ছবিটি ভেসে ওঠে তা কেউ জানতে পারে না। হয়তো তারা তা প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু আমরা কেন অন্য মানুষের মনে ভয় বা আতঙ্ক ছড়াতে যাব—বিষয়টিকে সেভাবেই গুরুত্বের সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তর খোঁজাসহ বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু-পরিবারের শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'-তে ইসলামিকরণের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার নজিরের সঙ্গে যেভাবে পরিচিতি ঘটে তা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অব্যাহত আছে। 'আমার বাংলা বই' দ্বিতীয় ভাগ-এর ৮-৯ পৃষ্ঠায় মসজিদের স্থাপত্য, আরবের ধু-ধু মাঠ ও খেজুরগাছের দৃশ্য-সংবলিত একটি আঁকা ছবির নিচে 'সবাই মিলে করি কাজ' শীর্ষক একটি রচনা লেখা হয়েছে। রচনাটি পড়ে দেখুন :

'বহু দিন আগের কথা। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) তখন মদিনা শহরে বাস করেন। শত্রুরা দুই দুইবার মদিনায় হামলা করল। কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না। মহানবী সবাইকে ডাকলেন। বললেন, শত্রুরা যেন কিছুতেই শহরে ঢুকতে না পারে। তাই শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা দরকার। অনেকে বলেন—এত পরিখা কীভাবে খনন করা যায়? মহানবী তাঁদের বললেন—সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয়। এটা দুই-একজন করতে পারবে না। সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

নবীজীর কথামতো দশজন করে কয়েকটি দল গড়া হল। কোনো দল কতটুকু মাটি কাটবে তা আগেই ঠিক করে নিতে বললেন তিনি।

মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। একটি দলে নয়জন কাজ করছিল। নবীজী সেখানে গিয়ে বললেন, আমিও তোমাদের দলে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুঁড়ি তুলে দাও।

মহানবীর কথা শুনে সবাই বললেন, আমরা থাকতে আপনি কেন এ কাজ করবেন?

নবীজী বললেন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা কাজ করবে আর আমি বসে বসে দেখব?

www.pathagar.com

সকলে আবারও আপত্তি জানালেন। মহানবী তাঁদের কথা শুনলেন না। বললেন, এটা আমারও কাজ। সবাই মিলে করলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে।

একথা বলে মহানবী নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি নিলেন। এটি দেখে সকলে মাটি কাটা শুরু করলেন।

শহরের চারদিকে পরিখা খনন শেষ হল। সকলে বুঝলেন—সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে না। কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায়। (৪. পৃ-৮-৯)

এই গল্পের সঙ্গে শব্দার্থ, নতুন বাক্য গঠন এবং প্রশ্ন নিয়ে আরো এক পৃষ্ঠার অধিক পাঠ-উপকরণ রয়েছে। 'সবাই মিলে করি কাজ' গল্পটি শিশুদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এতে সন্দেহ নাই। তবে তা মুসলমান-শিক্ষার্থীদের কাছে যতটা আকর্ষণীয় হয়েছে, অন্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের জন্য ততটা না-হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠ্যপুস্তকের পাঠ-উপকরণ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য। অথচ এক্ষেত্রে তা মানা হয়নি।

'আমার বই' তৃতীয় ভাগ তথা ৩য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে কবি সুফিয়া কামাল রচিত 'প্রার্থনা' কবিতা এবং লেখকের নামহীন 'মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনী' সম্বলিত দুই পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'প্রার্থনা' কবিতাটির সঙ্গে টুপি ও মাথায় ঘোমটা পরিহিত দুটি ছেলেমেয়ের অঙ্কিত ছবি শোভা পাচ্ছে। এ-ধরনের দৃশ্য অন্যধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের কাছে মুসলিম ধর্মীয় রীতিনীতির প্রার্থনার আবেশকে উপস্থাপন করে, যার সঙ্গে মানসিক ও ধর্মীয়ভাবে যুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কবিতাটি নিম্নরূপ :

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত
হে রহিম রহমান
কত সুন্দর করিয়া ধরণী মোদের করেছ দান
গাছে ফুল ফল
নদী ভরা জল
পাখির কণ্ঠে গান
সকলি তোমার দান।
মাতা, পিতা, ভাই, বোন ও স্বজন
সব মানুষের সবাই আপন
কত মমতায় মধুর করিয়া ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
তাই যেন মোরা তোমারে না ভুলি
সহজ সরল সৎপথে চলি
কত ভাল তুমি, কত ভালবাসা
গেয়ে যাই এই গান। (৫, পৃ-১৬)

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকে কবিতার শব্দার্থসহ অন্যান্য আলোচনায় ইসলামীকরণের যথেষ্ট ছাপ রয়েছে। কবিতাটি মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু অপরাপর ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের কাছে মুসলিম রীতি অনুযায়ী প্রার্থনার কারণে এতটা আকর্ষণীয় না-হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে।

একইভাবে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনীমূলক রচনাটিও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে মুসলিম-অমুসলিম বৈষম্যমূলক ধারণা তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। রচনাটি নিম্নরূপ :

চারদিকে আবছা অন্ধকার।

রাতের শেষ প্রহর। ঘুমজাগা পাখিরা ডানা ঝাপটে ওঠে। আরব দেশের মরুপ্রান্তরে হাওয়ার মাতামাতি। খেজুর পাতায় সে হাওয়ার কাঁপন লাগে। একটু পরেই আলো ফুটবে। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

সেই শুভক্ষণে একটি শিশুর জন্ম হল। দিনটি ছিল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ—আরবি মাসের ১২ রবিউল আউয়াল। শিশুর মাতার নাম আমিনা। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। পিতামহের নাম আব্দুল মুত্তালিব। শিশুটির জন্মের প্রায় ছয়মাস আগে তাঁর পিতা মারা যান।

শিশুর নাম রাখা হল মুহাম্মদ (স.)। মুহম্মদ কথাটির অর্থ প্রশংসিত। শৈশবে তাঁকে লালন-পালন করেন বিবি হালিমা। তিনি মায়ের মতো আদরে ও যত্নে মুহম্মদ (স.)-কে বড় করে তোলেন।

সারাজীবন তিনি বিবি হালিমাকে মনে রেখেছিলেন। নিজের মাথার পাগড়ি বিছিয়ে তিনি তাঁকে বসতে দিতেন। গভীর মমতায় তাঁকে মা বলে ডাকতেন।

শিশু মুহম্মদ (স.) পাঁচ বছর বয়সেই মাকে হারালেন। এর দু'বছর পর চিরবিদায় নিলেন পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব। সাত বছরের এতিম শিশু মুহম্মদ (স.) হলেন নিঃসঙ্গ। চাচা আবু তালিব তাঁর দেখাশোনার ভার নিলেন। বালক মুহম্মদ (স.) দূর পাহাড়ের ঢালুতে চাচার মেষ চরাতেন। মেষ চরাতে গিয়ে জীবজন্তুর প্রতি মমতায় তার হৃদয় ভরে উঠল। উঁচু উঁচু পাহাড় আর বিশাল মরুভূমি তাঁর মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল নিবিড়।

আবু তালিব ব্যবসার কাজে দেশে বিদেশে যান। একবার তিনি মহম্মদ (স.)-কে নিয়ে সিরিয়া গেলেন। পথের নানা দৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করল।

আরব দেশে তখন শান্তি ছিল না। মানুষে মানুষে হানাহানি চলত। অন্যায় ও অবিচারে দেশ ভরে গিয়েছিল। মুহম্মদ (স.) দুঃখী মানুষের কথা ভাবতেন। তিনি শান্তি চাইতেন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, ঝগড়া-বিবাদ মানুষের ক্ষতি করে। মানুষের সুখ-শান্তি নষ্ট করে। এসো আমরা ঝগড়া ভুলে যাই। সকলে মিলেমিশে বাস করি। মানুষের সেবা করি।

তাঁর কথায় কাজ হল। অনেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি সকলকে ভাল

www.pathagar.com

কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। লোকজন তাঁকে বিশ্বাস করল। তাঁরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকল, আল আমিন। আল আমিন কথাটির অর্থ বিশ্বাসী।

হযরতের বয়স তখন পঁচিশ। মক্কাবাসীরা তাঁকে ভালবাসে। তিনি তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। অসত্য ও অন্যায়কে ঘৃণা করেন। তিনি ভাবেন সৃষ্টির কথা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কথা।

তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। আল্লাহর বাণী এল তাঁর কাছে। তিনি ইসলামধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। তিনি হলেন ইসলামের নবী। অনেকে তাঁর কাজে বাধা দিল। তাঁর দিকে ঢিল ছুঁড়ল। পথে কাঁটা পুঁতে রাখল। খোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে মারতে ছুটে এল। তিনি সাহস হারালেন না। তিনি তাদের বোঝালেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখালেন। ধীরে ধীরে লোকজন তাঁর কথা শুনল। তাঁর কথা শুনে ভাল লাগল। তারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল।

হযরত মুহম্মদ (স.) আজীবন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। তিনি দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করেছেন। তিনি মানুষকে ভাল কাজ করতে বললেন। যারা খেটে খায় তিনি তাদের ভালবাসতেন। যারা লেখাপড়া করে তিনি তাদের ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, লেখাপড়া করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।' (৬. পৃ-১৮-১৯)

রচনাটি ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহম্মদ (স.)-কে বোঝা, চেনা, তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের আর্বিভাব এবং হযরত মুহম্মদ (স.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ বুঝতে মুসলমানধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করবে। ইসলামধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো এটি একটি প্রয়োজনীয় রচনা। কিন্তু সকল ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই রচনাটি পাঠ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শ্রেণীর রচনা ও কবিতায় যে-ধরনের অনুভূতি তৈরি হত এক্ষেত্রে তা আরো তীব্র হতে পারে। রচনাটি পাঠ না-করেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। শ্রেণী পাঠদান এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরদানেও তারা বাধ্য। সেক্ষেত্রে তাদেরকে একজন মুসলমান ছাত্রর মতোই উত্তর করতে হয় বা লিখতে হয়। একজন ভিন্নধর্মাবলম্বী কোমলমতী তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে থেকে একজন মুসলিম ছাত্রের মতো উত্তর চাওয়া নৈতিকতার দিক সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিন্নধর্মাবলম্বী এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের করার কিছু নেই—শেখা ও যথাযথ উত্তর প্রদান করা ছাড়া।

তৃতীয় শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি' (সমাজ) বইয়ের পাঠ-উপকরণসমূহে দেশের বাসগৃহ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, আমাদের প্রিয় উৎসব, আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় দিবস, আমাদের দেশ,

www.pathagar.com

জনসংখ্যা, প্রতিবেশী দেশের শিশু, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'আমাদের প্রিয় উৎসব' অধ্যায়ে ধর্মীয় উৎসবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শব-ই-কদর, শব-ই-মিরাজ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা, খ্রিস্টানদের বড়দিনের উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠটিতে মুসলমানদের উল্লিখিত উৎসবগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলেও হিন্দুদের তিনটি পূজা, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের একটি করে উৎসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠটি পড়ে বাংলাদেশের শিশুরা যার-যার ধর্মীয় উৎসবের বাইরে অন্যধর্মাবলম্বীদের নিয়ে কোনো জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত উৎসবের কথা ভাবতে শিখছে না।

উপরে উল্লিখিত উৎসবসমূহ শুধু বাংলাদেশব্যাপী নয়, অন্যান্য দেশেও ধর্মসম্প্রদায়সমূহ একই সময় উদ্‌যাপন করে থাকে। অথচ আমাদের প্রিয় উৎসব নববর্ষ, অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসমূহের বৈশাবী বা নববর্ষের উৎসব সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবসও আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসবের পরিচিতিদানে বা উপস্থাপনায় এই অধ্যায়ে যেভাবে ধর্মীয়করণ করা হয়েছে তাতে শিশুরা ধর্মীয়ভাবে উদ্‌যাপিত উৎসবের বাইরে জাতীয়ভাবে পালিত কোনো উৎসবের কথা ভাবতেই পারবে না। রচনাটিতে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎসবকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলা নববর্ষের উৎসব, কিংবা ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-উৎসবকে ছেলেমেয়েরা জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত উৎসব হিসেবে ভাবতে শিখছে না। শিশুদের মনে ধর্মীয় উৎসব উপস্থাপনের মাধ্যমে যে বিভক্তিরেখা তৈরি করা হয়েছে তার ফলে জাতিগতভাবে এক হয়েও শিশুরা তাদের সহপাঠী অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে সর্বক্ষেত্রেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে শিখছে। এর ফলে শিশুরা ভাবতে শিখবে যে এদেশে ধর্মীয় উৎসব ছাড়া আমাদের আর কোনো দিবস বা উৎসব নেই যেগুলো সব শিশু বা সকল ধর্মের মানুষ একসঙ্গে পালন করতে পারে। শিশুদের মধ্যে এর ফলে জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে সবসময় ধর্মীয় পরিচয়টিই মুখ্য হয়ে ধরা দেয়, মনোজগতে কাজ করে। সাম্প্রদায়িক বোধ, বিশ্বাস ও বিভক্তিসমূহ এসব পাঠ শিক্ষা থেকে তাদের মনের মধ্যে আরো দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। ধর্মগত বিভক্তি ও অনৈক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব শিক্ষা কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাব ফেলে।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ইসলামধর্মের নিয়মকানুন জানা ও মানার জন্য ইসলামশিক্ষার পাঠ্যবইতে আকাইদ, ইবাদত, আখলাক,

www.pathagar.com

কুরআন মজিদ তিলওয়াত, জীবনরচিত—এই পাঁচটি প্রান্তিক যোগ্যতাকে বিবেচনায় রেখে বিন্যস্ত করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে এর পরিচয়ের আলাদা আলাদা পাঠ্যপুস্তকে।

চতুর্থ শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'তে 'খলিফা হযরত ওমর (রা.), শিরোনামের প্রায় তিন পৃষ্ঠার (পৃ. ৪২-৪৪) একটি রচনা এবং কবি গোলাম মোস্তফার লেখা 'প্রার্থনা' কবিতা (পৃ.১১১) সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের কাছে হযরত ওমরের জীবন ও শাসন সম্পর্কীয় রচনা এবং গোলাম মোস্তফার 'প্রার্থনা' কবিতাটি বেশ শিক্ষণীয় হতে পারে। অন্য ধর্ম ও জাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা হওয়ার কথা নয়। চতুর্থ শ্রেণীর মুসলিম শিক্ষার্থীদের 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকে ৫টি অধ্যায়ে ঈমান ও আকাইদ, ইবাদত, কুরআন মজীদ শিক্ষা, আখলাক এবং নবী রসুল সম্পর্কে যেসব পাঠ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাতে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া আছে। পুস্তকটি ১০২ পৃষ্ঠা সম্বলিত। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ধর্মশিক্ষার জন্য এর পাঠ্য-উপকরণ পর্যাপ্ত বলেই মনে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চমশ্রেণীর 'আমার বই' পাঠ্যপুস্তকে 'বিদায় হজ্ব' শীর্ষক একটি রচনা (পৃ. ৬৬-৬৮) সংকলিত হয়েছে। এই রচনার মূল বিষয় হচ্ছে ইসলামধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স.) কর্তৃক আরাফাত ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ। পুস্তকে আরও দুইপৃষ্ঠাব্যাপী বিদায়হজ্বের বিভিন্ন প্রশ্ন, শব্দার্থ, শব্দের ব্যবহার, বাক্যগঠন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর আমার বইতে গদ্যাংশ এবং পদ্যাংশে এক বা একাধিক পাঠ-উপকরণ ইসলামধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (স.) অথবা তাঁর অনুসারী কোনো একজন খলিফার জীবনী, শাসন, একইসঙ্গে ইসলামধর্মের কোনো-না-কোনো দিক নিয়ে আলোচনা, ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব রচনা বা কবিতা থেকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হচ্ছে। অন্যধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা ইসলামধর্ম-সম্বলিত এসব রচনা পড়তে বা শিখতে বাধ্য হচ্ছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের তা পড়া বা করা ছাড়া উপায় নেই।

পঞ্চম শ্রেণীর ইসলামশিক্ষা বইতে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

চার

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেও শিক্ষা বিজ্ঞানের শিক্ষণ এবং দর্শনকে ভঙ্গ করে ধর্মসংক্রান্ত রচনাবলির প্রতিশ্রেণীর নির্ধারিত ধর্মশিক্ষার বইর বাইরে কতখানি উপস্থাপিত হয়েছে তা নিম্নে দেখানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ শ্রেণীর 'চারুপাঠ' বাংলা বইতে ইসলামধর্ম বিষয়ক কোনো রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা 'সততার পুরস্কার' রচনাটির মূল বিষয় ইহুদি ধর্মাবলম্বী তিনজন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এদের একজন রোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা এবং একজন অন্ধ। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় একজন ফেরেশতা এই তিন ব্যক্তির তিন ধরনের সমস্যার সমাধান করিয়ে দিয়েছিল। ফেরেশতার কাছে পরবর্তী সময়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রথম দুজন তাদের অতীত অবস্থা ভুলে গেছে এবং তারা ফেরেশতার প্রতি অকৃতজ্ঞের আচরণ করেছে, অন্ধ অন্যজন আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে, আল্লাহ প্রথম দুজনকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, শুধুমাত্র তৃতীয় অন্ধজনকে ভালো রাখলেন। অকৃতজ্ঞরা তাদের উপযুক্ত ফল পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে যেভাবে রচনাটি উপস্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হবে না এটি ইহুদিধর্মাবলম্বীদের নিয়ে রচিত কোনো গল্প। মনে হবে এটি আল্লাহ, ফেরেশতা ও মুসলমানদের মধ্যকার কোনো ঘটনা। তবে আল্লাহ ফেরেশতাদের কাউকে সাধারণ মানুষের কাছে পাঠিয়ে পরীক্ষা করার উদাহরণ সাধারণভাবে অপ্রচলিত। যদিও গল্পের পাঠ-পরিচিতিতে দাবি করা হয়েছে 'আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং সৎ লোকদের যথাযথ পুরস্কার দেন' (পৃ-৮, চারুপাঠ)। ধর্মমতে মানুষের জন্য আল্লাহর পুরস্কার মানুষের মৃত্যুর পর নির্ধারিত হয়। গল্পটিতে যেভাবে আল্লাহ, ফেরেশতা ও তিনজন সমস্যাপীড়িত মানুষকে উপস্থাপন করা হয়েছে তা শিশুদের মনোজগতে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়াদি দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে সহায়তা করতে পারে।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইসলামশিক্ষায় ইসলামধর্মের আকাইদ, ইবাদত, কুরআন মাজীদ, আখলাক এবং ১২ জন নবী ও পীর-দরবেশের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা ইসলামধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানা ও শেখার সুযোগ এ পুস্তকে পাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

সপ্তম শ্রেণীর 'সপ্তবর্ণা' পাঠ্যপুস্তকে হবীবুল্লাহ বাহারের লেখা 'মরু-ভাস্কর' প্রবন্ধে (পৃ. ৯-১১) হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বইতে লেখা হয়েছে, "আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে" (পৃ. ১১)। অবশ্য বার বার ইসলামধর্মের নবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনীর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামধর্মের আদর্শ সম্পর্কে তাদের বেশি-বেশি আকৃষ্ট করা। তাছাড়া আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মকে বাদ দিয়ে শুধু ইসলামের কথাই এককভাবে বলা হয়ে থাকে। ভিন্নধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই প্রবন্ধটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

www.pathagar.com

এই পুস্তকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ইনসানিয়াত' প্রবন্ধটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মনুষ্যত্ব ও জীবনাদর্শের একটি দিক উপস্থাপিত করে রচিত হয়েছে। পদ্মানদীতে স্টিমার একজন ধার্মিক মুসলমানকে তার নামাজ পড়ার জন্য একজন অন্যধর্মাবলম্বী (লেখক) মানুষ জায়গা ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন করে এই লেখাটি রচিত হয়েছে। লেখক একজন মুসলমানকে নামাজ আদায়ের জন্য স্থান ছেড়ে দেওয়াতে নামাজি মানুষটি যেমনি খুশি হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন; একইভাবে লেখকও ধর্ম-সম্পর্কে একজন সাধারণ মুসলমানের উদার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই প্রবন্ধে একজন অশিক্ষিত মুসলমানের যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তা লেখককে অভিভূত করেছে। মূলত অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ধর্ম পালনে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের এগিয়ে আসা, ইত্যাদি উদারনৈতিক শিক্ষাও প্রবন্ধটির মূল মর্মবাণী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বইটির ১১৪ থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খুলনার খান জাহান আলী মসজিদের পুরাকীর্তি, স্তম্ভ, মিনার, গম্বুজ, ইত্যাদি নিয়ে আ-কা-মো যাকারিয়ার রচিত 'একটি অনন্য পুরাকীর্তি' প্রবন্ধটি মুসলমানদের একটি ঐতিহাসিক মসজিদের পরিচিতি বহন করে। এছাড়া কবি আবদুল কাদিরের লেখা 'মানুষের সেবা' কবিতাটি আল্লাহর নিকট রোগকাতর মুসলমানের আবেদনের ধরনটি বহন করে, যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বোঝা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সংকোচ তৈরি হতে পারে।

সপ্তম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধর্ম সম্বন্ধে ১৯ থেকে ২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া হয়েছে। এতে ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে পরিচিতিমূলক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য ধর্মগুলোর ইতিহাস, ধর্মীয় রীতিনীতি, বিশ্বাস ও উপাসনালয়ের ধরন-ধারণ এতে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি পড়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রধান ৪টি ধর্ম এবং ঐসব ধর্ম বর্তমানে পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করছে, বাংলাদেশে ঐ ধর্ম চারটির বিশ্বাসীদের সংখ্যা কত সে-সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে এর থেকে ছাত্রছাত্রীগণ ধর্ম-পরিচিতিমূলক কিছু ও জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আসলে এ-ধরনের সব ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধের গুরুত্ব স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক বেশি। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকে তেমন উদ্যোগ এই একটি ছাড়া চোখে পড়ে না।

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় (৩০-৫৮ পৃ.) ও চতুর্থ অধ্যায়-এ (৫৯-৮৭ পৃ.) যথাক্রমে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ (১২০৬-১৭৫৭), মধ্যযুগে বাংলাদেশ (১২০৪-১৭৫৭)-এর ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের উক্ত পর্বের (দ্বাদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর) ইতিহাসে মুসলিম আগমন, শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব কতখানি পড়েছে তা এ আলোচনায় সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এ দুটো অধ্যায়ের পাঠ-উপকরণ পড়ে মধ্যযুগের যে-ইতিহাসের ধারণা লাভ করছে তা খণ্ডিত এবং

www.pathagar.com

একদেশদর্শী। শেষ বিচারে এ-ধরনের ইতিহাস পঠনপাঠন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া ও জাগ্রত করার ক্ষেত্রেই সহায়ক হয় বেশি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিহাসের নির্যাস-সমৃদ্ধ ধারণা বা চেতনার বিকাশ এর ফলে অনেকাংশে সংকটগ্রস্ত হয়।

সপ্তম শ্রেণীর 'ইসলাম শিক্ষা' পুস্তকে মুসলমান শিক্ষার্থীগণ ইসলামের আকাইদ, ইবাদত, কুরান মাজীদ, হাদিস, আখলাক এবং ১২ জন নবী ও দরবেশের জীবনী বিষয়ক পাঠ-উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

মুসলমান শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতিটি ক্লাসের ধর্মশিক্ষা ইসলামধর্মের উপযুক্ত বিষয়সমূহকে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে জানা এবং শেখার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরাও তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক থেকে জানতে পারছে।

অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা'য় বিশেষ কোনো ধর্মের বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত কোনো প্রবন্ধ, নিবন্ধ অথবা কবিতা সংকলিত হয়নি। এই শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন, পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন, এবং সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় তথা বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এসব পর্বের বিষয়াদি পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলার সমাজে ধনী ও দরিদ্রের বিভাজনকে পঠিত ইতিহাসের এই অধ্যায়সমূহে অবচেতনে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিভাজনে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত ১৯০৫ সালের বঙ্গবঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের বিভাজন-বিভক্তির পেছনে ইংরেজ, জমিদার-অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কূটচাল ও রাজনৈতিক উদ্যোগকে পাঠ্যপুস্তকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কিংবা সরলীকরণ করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মুসলিম অবাঙালি অভিজাতশ্রেণীর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকে মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে দেখানোর প্রবণতা আমাদের দেশে এখন আর মোটেও প্রচ্ছন্ন কিছু নয়, বরং প্রকাশ্যে করা হচ্ছে। এ থেকে সাম্প্রদায়িক ধারণা পঠনপাঠনের মাধ্যমে লালন ও জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর 'ইসলামশিক্ষা' পূর্ববর্তী শ্রেণীর পাঠ-উপকরণকে অনুসরণ করে করা হয়েছে। সে কারণে এই আলোচনার পুনরাবৃত্তি আর প্রয়োজন নেই।

নবম-দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য' বইতে ইব্রাহীম খাঁর লেখা 'ইসলামের মর্মকথা' (৬৬-৭২ পৃ.) এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচিত 'মানুষ মুহাম্মদ (স.)' (৭৩-৭৯ পৃ.) প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু আমরা দেখতে পারি। ইব্রাহীম খাঁর প্রবন্ধটি সম্পর্কে বইতেই বলা হয়েছে : "লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। ইসলামের একত্ববাদ মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। স্রষ্টার অনুগ্রহ কামনায় মুসলমানদের জন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। .... প্রবন্ধটির মাধ্যমে ইসলামধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা চলে"(পৃ.৭১)। 'মানুষ মোহাম্মদ (স.)' প্রবন্ধ সম্পর্কেও পুস্তকটিতে লেখা হয়েছে, "হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হযরত ছিলেন মানুষের নবী। তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন" (পৃ.৭৭)।

ইব্রাহীম খাঁর লেখা 'ইসলামের মর্মকথা' ইসলামধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় প্রবন্ধ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামধর্মের মূল দিকগুলো লেখক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধে ইসলামের একেশ্বরবাদী আদর্শের জোরালো উপস্থাপনা অন্যধর্মালম্বী ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবস্থানকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার সুযোগ রয়েছে যা কোনো সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যাশিত নয়। মানুষ হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.) এর গুণাবলির উপস্থাপনা, হযরত মুহাম্মদকে নানাদিক থেকে জানার সুযোগ করে দেওয়া—এ-ধরনের চিন্তা প্রবন্ধটি সংকলনে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত অন্য কোনো ধর্মের প্রবর্তক সম্পর্কে কোনো রচনা অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু ইসলামধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এ কর্ম ও জীবনী বারবার পাঠ্যপুস্তকের বাংলা গদ্যাংশে উপস্থাপন করার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে মনে হতে পারে অন্যধর্মের প্রবর্তকদের কোনো গুরুত্ব হয়তো নেই, অথবা তারা তেমন মহামানব বলে হয়তো কেউ নন—এমন ধারণাই শিক্ষার্থীরা পোষণ করতে পারে।

নবম-দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলন 'পদ্য'-এ কাজী নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' এবং ফররুখ আহমদের 'সাত-সাগরের মাঝি' কবিতা দুটো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিতাদুটোতে ইসলামের একান্ত ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। ফররুখ আহমদ ইসলামের পুনর্জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি ইসলামের আদর্শের তরী জাতীয় জীবনের ঘাটে ভেড়ার মাঝিকে দেখতে পাচ্ছেন। জাতীয় জীবনে তিনি ইসলামের নবযুগ সূচিত হতে দেখছেন। পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষা পাসের জন্যে নির্ভরশীলতার কথা বিবেচনা করলে ভিন্নধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের নিকট এ দুটো কবিতার বিষয়বস্তুকে ধারণ করতে বাধ্য করা ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের স্কুলপাঠ্য পুস্তকে শুধুমাত্র ইসলামধর্মকে অবলম্বন করে রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা শেখার বাধ্যবাধকতা ক্ষুদ্র ধর্ম ও জাতি-সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতার ওপর একধরনের চাপ সৃষ্টি করে থাকে যা আমাদের নতুন করে ভেবে দেখা উচিত।

নবম-দশম শ্রেণীতেও মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকে আকাইদ, শরিয়ার উৎস, বেদাত, আকিদা, জীবন-দর্শন শেখার সুযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে : 'রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলন' (পৃ. ৭০-৮০)। মূলত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাবে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনসমূহ এতে বিবেচিত হয়েছে। সেই আন্দোলনকে আলীগড় আন্দোলন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, লাহের প্রস্তাব ইত্যাদি ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ-সময়ের আন্দোলনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র ধারাকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে 'বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস'। এ বিষয়টিতেও বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস উপস্থাপনে সম্প্রদায়গত বিভক্তির সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ-পূর্ব ও উত্তর রাজনীতির আলোচনায় মুসলি- হিন্দু বিভাজনের বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এসে স্থান করে নিয়েছে। তার ফলে এতে বৃহত্তর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা রাজনীতিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং, ১৯৪০ সালের লাহের প্রস্তাবকে ভারত-পাকিস্তান জন্মের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখা হয়েছে "দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে জন্ম হয়" (পৃ-১০৪)। ইতিহাস পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেয়ে মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পাঁচ

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ইসলামধর্মকে সর্বত্র এককভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্লাসের জন্য ধর্মশিক্ষার একটি পৃথক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও বাংলাবইতেও ইসলামধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আবশ্যকীয় করা হয়েছে। দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানধর্মে বিশ্বাসী ছাত্রছাত্রীরা এসব পাঠ-উপকরণ পড়তে এবং পরীক্ষায় পাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি 'পরিবেশ পরিচিতি'র মতো বিষয়েও শিশুরা ইসলামধর্মের শিক্ষা-উপকরণ পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে অবলম্বন করে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, পদ্য, জীবনী, ইতিহাস, ইত্যাদি রচনা পড়তে অন্যধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে। এ-ধরনের পাঠক্রম পড়ে একজন শিক্ষার্থী যখন এসএসসি পাস করে তখন তার কাছে বাংলাদেশে একমাত্র ইসলামধর্মেরই গুরুত্ব বিবেচিত হচ্ছে, বাংলাদেশে অন্য ধর্মসমূহের অবস্থান কোনোভাবেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুভূত হচ্ছে না। সেই ছাত্র যদি মুসলিম হয়, তার কাছে ইসলামই একমাত্র

www.pathagar.com

ধর্ম, অন্য ধর্মের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার এবং মহামানবদের সম্পর্কের বিষয়সমূহ বেশ অস্পষ্ট এবং প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। যদি অন্য ধর্মের শিক্ষার্থী হয়, তাহলে সে তার নিজের ধর্ম নিয়ে অসহায়ত্বের মুখোমুখি হয়। অথচ একজন শিক্ষার্থীর জীবনে শিশুকালে ধর্ম বাছাই করার কোনো সুযোগ নেই। উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত ধর্মকে আমরা সকলে নিজের ধর্ম বলে মেনে নিই, সেই ধর্ম পালন করার চেষ্টা করি, সেই ধর্ম সম্পর্কে জানারও চেষ্টা করি। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ধর্মের নীতিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন থাকবে, অন্যধর্মাবলম্বীরাও শুধুমাত্র ঐ একটি বিশেষ ধর্মের শিক্ষণীয় বিষয় শিখবে তা মোটেও গণতন্ত্রসম্মত নয়। বরং পাঠ্যপুস্তকে যদি ধর্মীয় নীতিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি এনসিটিবি নীতিগতভাবে গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা উচিত। সেক্ষেত্রে সকল ধর্মের নির্যাস ও মর্মবাণী থেকে সমানভাবে কিছু কিছু বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে ধর্ম-নির্বাচনে শিশুদের কোনো হাত নেই, এখানে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ নেই। সুতরাং ধর্মের এমন কোনো বিষয় পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়, যা শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করতে পারে, তাকে অসহায় বা বিপন্ন অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে। বরং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সকল ধর্মের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বোধ ও ধারণা গড়ে-তোলার চিন্তাভাবনাই পাঠ্যপুস্তকে কার্যকর থাকা উচিত। তাহলে ধর্ম-পরিচয় কাউকে জাতিগত পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করবে না, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভাজনও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না।

একটি দেশে একাধিক ধর্ম ও জাতিগত পরিচয়ের নাগরিক বসবাস করে থাকে, এটিই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নাগরিকবোধ তখনই শক্তিশালী হবে যখন কোনো ধরনের বিভক্তি ও বিভাজনের অপপ্রয়াস রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা না পায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল প্রজন্মকে গড়ে তোলার চিন্তাচেতনায় কাজ করতে হয়। তবেই সকল নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে একনিষ্ঠ হতে পারে। বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড়াতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভেদ-উৎপত্তির বিষয়গুলো দূর করতে হবে। সেক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা গড়ে-তোলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে-তোলার কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশনা

১. আমার বাংলা বই, প্রথম ভাগ, এনসিটিবি, ২০০৪;
২. আমার বাংলা বই, দ্বিতীয় ভাগ, এনসিটিবি, ২০০৫;
৩. আমার বাংলা বই, তৃতীয় ভাগ, এনসিটিবি, ২০০৫;
৪. আমার বাংলা বই, চতুর্থ ভাগ, এনসিটিবি, ২০০৪;
৫. আমার বই, পঞ্চম ভাগ, এনসিটিবি, ২০০৪;
৬. চারুপাঠ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
৭. সপ্তবর্ণা, সপ্তম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
৮. সাহিত্য কণিকা, অষ্টম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
৯. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১০. মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১১. পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তৃতীয় শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১২. সামাজিক বিজ্ঞান, সপ্তম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৩. সামাজিক বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৪. সামাজিক বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৫. বাংলাদেশ ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস নবম-দশম শ্রেণী, ২০০৪;
১৬. ইসলাম শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৭. ইসলাম শিক্ষা, চতুর্থ শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৮. ইসলাম শিক্ষা, পঞ্চম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
১৯. ইসলাম শিক্ষা, ষষ্ঠ শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
২০. ইসলাম শিক্ষা, সপ্তম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
২১. ইসলাম শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;
২২. ইসলাম শিক্ষা, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ২০০৪;

www.pathagar.com

www.pathagar.com